# বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-আগস্ট। সাল-২০২৬

কমনওয়েলথে দাপুটে ভারত

## সপ্তধারায় বিকশিত ভারত গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর

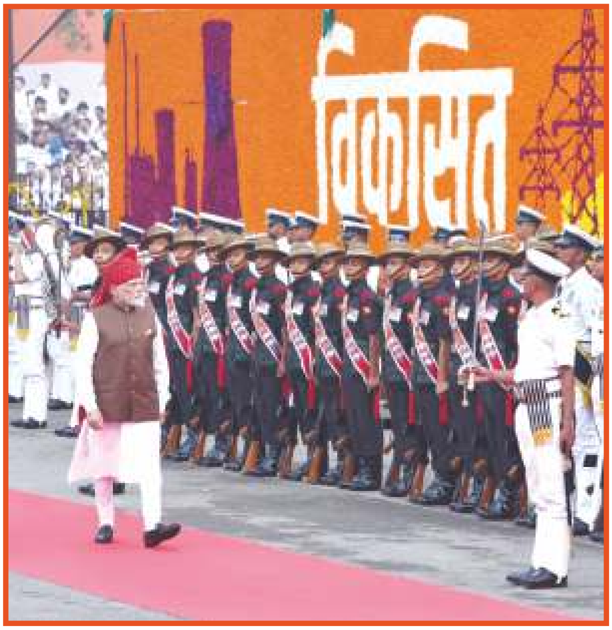


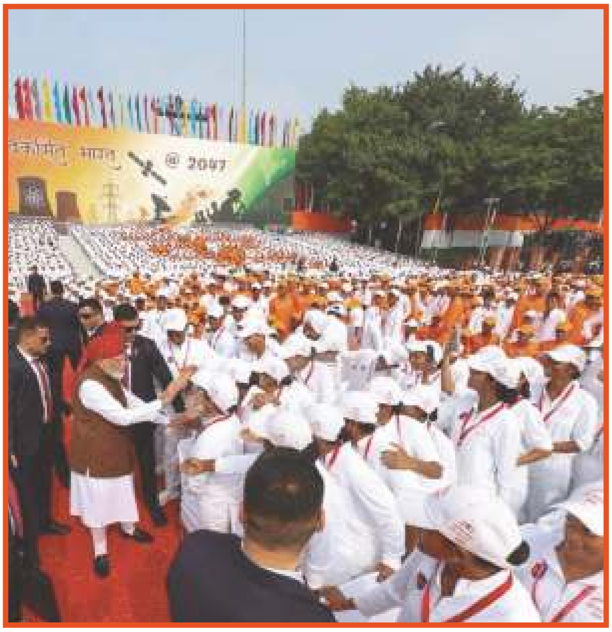


*লালকেল্লায় ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।*

*স্বাধীনতার সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।*

*প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের আত্মজীবনী প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী।*

বঙ্গ
# কমলবার্তা
আগস্ট সংখ্যা। ২০২৬

**৮০তম স্বাধীনতা দিবসে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে বিকশিত ভারতের যাত্রা** ৪
*জয়ন্ত গুহ*

**আরশোলাদের দাপাদাপির পিছনে আসলে কারা?** ৭
*দিব্যেন্দু দালাল*

**জনতার দরবারে জননেতা** ১০
নুপুর মুখার্জী

**তসলিমার প্রত্যাবর্তন** ১২
*মোহিত রায়*

**'ডবল ইঞ্জিন' মডেলে বাংলার অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সদিচ্ছা থাকলে সম্ভব স্বপ্নপূরণ** ১৫
*সোমনাথ গোস্বামী*

**ছবিতে খবর** ১৮

**বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় চেতনাঃপ্রয়াণ দিবসে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য** ২৪
*ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী*

**পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস** ২৮
*দীপল বিশ্বাস*

**বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে নতুন ভারতের উত্থান গ্লাসগোর গৌরব, আহমেদাবাদের স্বপ্ন** ৩২
*অভিরূপ ঘোষ*

**সম্পাদক:** জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
**কার্যনির্বাহী সম্পাদক :** অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
**সহযোগী সম্পাদক :** জয়ন্ত গুহ
**সম্পাদকমন্ডলী:**
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, শুভজিৎ আওন, অনিকেত মহাপাত্র
**সার্কুলেশন:** সঞ্জয় শর্মা

## সম্পাদকীয়

দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে কোথাও কোনও অনুষ্ঠানে দেখা গেলনা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীনতা দিবসের কোনও কর্মসূচিতেই তাকে দেখা গেল না। কোথাওই তিনি পতাকা উত্তোলন করলেন না। নিজের বাড়ির উঠানেও নয়। এমনকি ১৪ অগস্ট রাতে 'মিড নাইট ফ্রিডম'ও পালন করলেন না। কেন? একদা কংগ্রেস নেত্রীর এ হেন আচরণ নিয়ে মানুষের মনে তো প্রশ্ন উঠবেই!

যেমনটা প্রশ্ন উঠেছে, স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীর আচরণ নিয়ে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতর ইন্দিরা ভবনে স্বাধীনতা দিবস পালনের অনুষ্ঠানে জাতীয় গান পরিবেশনে বাধা দিচ্ছেন সনিয়া! হাত নেড়ে কথা বলছেন, আপত্তি জানাচ্ছেন 'বন্দে মাতরম্' গান চলাকালীন! ওই ভিডিয়োয় সনিয়ার পাশেই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গেকে। তিনিও কথা বলছেন 'বন্দে মাতরম্' গান চলাকালীন! কেন? তাহলে কি 'বন্দে মাতরম্'-এর পুরো গান গাওয়া নিয়েই কংগ্রেস দলের আপত্তি আছে? প্রশ্ন তো উঠবেই!

যেমন প্রশ্ন উঠছে, কেন স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকার কখনও স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া বাধ্যতামূলক করেনি? অসুবিধা কোথায়? ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে জনসমক্ষে গেয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম্'। যে গান পরবর্তী কালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি শক্তিশালী দেশাত্মবোধক স্লোগান ও প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। তাহলে কেন 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে কংগ্রেস সরকারের এমন অবহেলা ছিল?

কেন স্বাধীনতার পর দেশের কোনও স্বাধীনতা দিবসেই 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয়নি? 'বন্দে মাতরম্' গাইলেই তো একজন দেশভক্ত ভারতীয়ের ধমনীতে রক্ত ছোটে ঘন্টায় ১৭০ মাইল বেগে। 'বন্দে মাতরম' শুনলেই তো বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়ে যাবে। মনে পড়ে যাবে 'আনন্দমঠ'-এর কথা। বিপ্লবীদের কাছে যে 'আনন্দমঠ' আর 'বন্দে মাতরম্' ছিল দেশ স্বাধীন করার বীজমন্ত্র সেই মন্ত্র কি মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস সরকার নাকি নিজেরাই ভুলে গিয়েছিল।

কংগ্রেস কি ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল দেশের স্বাধীনতায় বীর বিপ্লবীদের অবদান এবং তাঁদের স্মরণে লেখা মোহিনী চৌধুরীর সেই বিখ্যাত গান? "যাঁরা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা/ মৌল মলিন মুখে জোগালো ভাষা/ আজি রক্ত কমলে গাঁথা/ আজি রক্ত কমলে গাঁথা মাল্যখানি/ বিজয় লক্ষ্মী দেবে তাঁদেরই গলে…মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান"।

# ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে

# বিকশিত ভারতের যাত্রা

**জয়ন্ত গুহ**

**যে ভারতবিরোধী শক্তি সংসদ থেকে রাজপথে উঠেপড়ে লেগেছিল সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য তাঁদের আবারও একবার একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নরেন্দ্র মোদী তাঁর ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে। সংঘাতে নয়। সপ্তসিন্ধুর দার্শনিক শক্তিধারায়। স্বদেশচেতনায় দেশের যুবশক্তিকে আবারও এক সুরে বেঁধে দিলেন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে।**

নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১২ বছরে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন। এবারের এই স্বাধীনতা দিবস ছিল ঐতিহাসিক। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা দিবসে দিল্লির লালকেল্লায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হল। এবারের স্বাধীনতা দিবসের মূল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলনের সময় এই প্রথম পরিবেশিত হল 'বন্দে মাতরম্'। 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ (১৫০ বছর) এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত নরেন্দ্র মোদী সরকারের। 'বন্দে মাতরম্' বাজানো ও গাওয়ার পর ঐতিহ্যবাহী নিয়ম মেনে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'ও পরিবেশন করা হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন এসেই যায়। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন তো কংগ্রেসের সরকার ছিল। তাঁদের কখনও 'বন্দে মাতরম্'-কে শ্রদ্ধা জানানোর কথা মনে আসেনি? স্বদেশচেতনা থেকে সরতে সরতে কংগ্রেস এখন দেশ বিরোধিতার পথে। আর গত ১২ বছরে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিদিন আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন স্বদেশচেতনা।

ঠিক যেমনটা ফিরিয়ে দিলেন ১৫ আগস্ট ২০২৬। আবারও। ৭৫ মিনিটের ভাষণে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে স্বদেশচেতনায় তিনি দেশকে পথ দেখালেন, বলা ভাল উদ্বুদ্ধ করলেন সহজ সরল অথচ গভীর দিশায়। দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘাতের পথে না হেঁটে তিনি দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপথ এঁকে দিলেন। স্বপ্ন, সঙ্কল্প, সামর্থ্য এবং সাফল্যের গণ্ডীতে। কিন্তু ছোট নয়, স্বপ্ন হতে হবে অনেক বড়। তাহলেই সঙ্কল্প, সামর্থ্য এবং সাফল্যও আকাশছোঁয়া হবে। আর এখানেই এসেছে 'সপ্তধারা'-র প্রসঙ্গ। সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে এনে নরেন্দ্র মোদী দেখিয়েছেন 'সপ্তধারা'র স্বপ্ন।

লালকেল্লা থেকে শক্তির 'সপ্তধারা'র সাত শক্তিতে ভর করে

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে যাত্রার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আসলে এককথায় সংস্কার কর্মসূচি। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাত দফা সংস্কার কর্মসূচিই এই 'সপ্তধারা'। স্বাধীনতার ১০০ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'বিকশিত ভারত' নির্মাণের মূল ভিত্তি হয়ে থাকবে এই 'সপ্তধারা' বা সাত শক্তি।

**প্রধানমন্ত্রীর সাত দফা সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে উৎপাদন শক্তি :**

ভারতকে যন্ত্রাংশ এবং নকশা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত পুরো 'ভ্যালু চেইন' উন্নত করতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি বিশ্বস্ত কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে। প্রধানমন্ত্রী

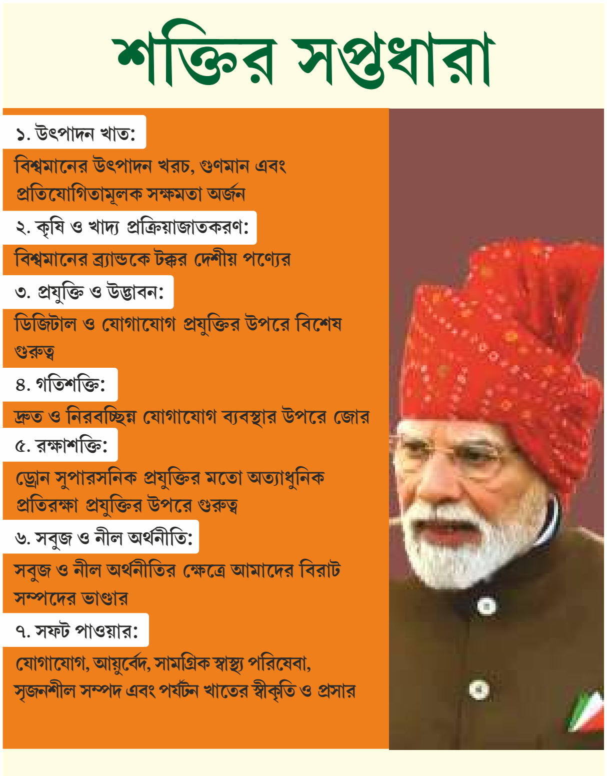


খরচ, গুণমান এবং পরিমাণ, প্রতিযোগিতামূলক কারখানা, ব্যবহারকারী-বান্ধব পণ্য, আকর্ষণীয় মোড়ক এবং ত্রুটিহীন উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছেন। গুণমানের সঙ্গে কোনও আপস না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় উৎপাদনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত– ''গুণমান, গুণমান, গুণমান''।

**সপ্তধারার দ্বিতীয় ধারা কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ :**

প্রধানমন্ত্রী কৃষি থেকে রপ্তানি বাজারের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যশস্য, বাজরা, মশলা, ফল ও ফুলকে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি রাসায়নিক-মুক্ত চাষাবাদ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণকারী কৃষি পণ্যের ওপরও জোর দিয়েছেন।

**তৃতীয় ধারা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন শক্তি :**

এআই, কোয়ান্টাম, মহাকাশ, রোবোটিক্স এবং ডেটা সেন্টার সহ উদীয়মান ক্ষেত্রগুলির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে শুধু বিশ্বের একটি বাজার হয়ে থাকলে চলবে না, বরং উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে হবে। তিনি বলেন, 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে প্রতিটি কোণে ৬জি পৌঁছে দেওয়া দেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

**চতুর্থ ধারা গতি শক্তি :**

প্রধানমন্ত্রী শহরের সঙ্গে সংযোগকারী দ্রুতগতির রেল, আধুনিক সড়ক, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বিমানবন্দর এবং মাল্টিমোডাল লজিস্টিকসের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত সংযোগ স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, শুধুমাত্র পণ্য ওঠানো-নামানোর বাইরে গিয়ে বন্দরগুলিকে বন্দর-চালিত উন্নয়ন ও অগ্রগতির চালিকাশক্তি

হতে হবে।

**পঞ্চম ধারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা :**

প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরশীলতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে ভারতকে অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বিশেষভাবে ড্রোন ও কাউন্টার-ড্রোন সিস্টেম তৈরি এবং হাইপারসনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সাইবার নিরাপত্তাকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, যেখানে ভারতীয় যুবকদের সক্ষমতাকে দেশ ও বিশ্বের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

**ষষ্ঠ ধারা অর্থনৈতিক শক্তি :**

অর্থনীতির ক্ষেত্রে দু'ধরনের বিষয়ে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী— পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি (গ্রিন ইকোনমি) এবং

সমুদ্রবান্ধব অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি)। প্রথমটির ক্ষেত্রে পরিবেশের ক্ষতি না-করে কর্মসংস্থান তৈরি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপায় সন্ধান হবে সরকারের প্রাধান্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমুদ্র, নদী বা যে কোনও জলাশয়ের জলকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির উন্নয়নের কথা বলা হয়। তবে সমুদ্র বা পরিবেশের ক্ষতি না করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

**সপ্তম ধারা ভারতের 'সফ্ট পাওয়ার' :**

প্রধানমন্ত্রী যোগ, আয়ুর্বেদ, সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং 'হিল ইন ইন্ডিয়া'-য় ভারতের শক্তিকে বিশ্বে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি হস্তশিল্প, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, ভিএফএক্স, অ্যানিমেশন, গেমিং এবং ডিজিটাল কনটেন্টকে এমন ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, যেখানে ভারত বিশ্বব্যাপী তার শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি বিদেশি পর্যটক, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং কনসার্টকে ভারতে আকৃষ্ট করার জন্য আরও বেশি প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

২০২২ সালে দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লা থেকে 'পাঁচ প্রতিজ্ঞা'-য় দেশকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এ বার দেশের যুব শক্তির সঙ্গে শক্তির সপ্তধারা মিলিয়ে দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশকে আরও বড় করে ভাবার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, আগামী দশকে ফরচুন ৫০০-এর তালিকায় ভারতের ৫০টি কোম্পানি কেন থাকবে না? তিনি বলেন, বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি ব্যাঙ্কের মধ্যে একটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক থাকা উচিত এবং বিশ্বের পাঁচটি বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানির মধ্যে এক বা দুটি ভারতীয় ওষুধ কোম্পানির স্থান পাওয়া উচিত। এখানেই শেষ নয়। তিনি দেখতে চান, ভারতীয় আইন সংস্থা, রেটিং এজেন্সি, পরামর্শদাতা সংস্থা এবং হিসাবরক্ষণ সংস্থাগুলি যেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে উঠে আসে, ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যেন বিশ্বনেতা হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলো যেন দেশের এমন পরিচয়ে পরিণত হয়, যা বিশ্বকে আকর্ষণ করবে।

আসলে রাজনৈতিক বিরোধীতার মোড়কে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, আম জনতা পার্টি-কংগ্রেস এবং দেশবিরোধী বাম-ইসলামিক ভূতের ঘাড়ে চেপে দেশের বাইরের যে ভারতবিরোধী শক্তি সংসদ থেকে রাজপথে উঠেপড়ে লেগেছিল সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য তাঁদের আবারও একবার একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নরেন্দ্র মোদী তাঁর ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে। সংঘাতে নয়। সপ্তসিন্ধুর দার্শনিক শক্তিধারায়। স্বদেশচেতনায় দেশের যুবশক্তিকে আবারও এক সুরে বেঁধে দিলেন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রীর পথেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও কলকাতায় রেড রোডে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মঞ্চে ডাক দিয়েছেন বিকশিত ভারতের। তাঁর কথায়, '২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই সম্ভব হবে, যখন বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ সম্ভব হবে,' যা প্রধানমন্ত্রী এর আগে বলেছেন বহুবার।

# আরশোলাদের দাপাদাপির পিছনে আসলে কারা?

## ভারত সরকারকে বিপাকে ফেলতে দেশী-বিদেশী শক্তির ব্যর্থ ষড়যন্ত্র

**দিব্যেন্দু দালাল**

**২০১৯ সাল থেকে মাঝেমাঝেই হয়। আরও একবার হল মোদী বিরোধী আন্দোলন। যতবারই হয় ততবারই বিবিসি-কে সাক্ষাৎকার দেয় 'ফান্ডেড নেতা' যোগেন্দ্র যাদব। আগুনঝরা বিপ্লবী সাক্ষাৎকার। আশায় আশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বাম-কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টি। এরপর শেষ মুহূর্তে যথারীতি গোল লক্ষ্য করে মোদী-শাহের একটি জোরালো শট। ব্যাস। চুপসে যাওয়া বিরোধীতার বেলুন হাতে নিয়ে 'বিপ্লবী'রা আর পরবর্তী নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানোর পথে বিজেপি। এটাই হয়। এবারও হয়েছে।**

২০১৬ সালে সার্বিয়ার "ওটপোর" (সার্বিয়ার ছাত্র ও যুব আন্দোলন) আন্দোলনের নেতা স্রদা পোপোভিচ্ ভারতে 'লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স'-এর India Summit-এ অংশ নিতে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় আম আদমি পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্র যাদবের সঙ্গে।

এই সেই 'লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স' যারা গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতবিরোধী বিভিন্ন বয়ান তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন মোদী-বিরোধী আন্দোলনের কিছু পরিচিত মুখের যোগাযোগ আছে। মুকুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীর্ঘদিন ধরে 'লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স' - র ইকোসিস্টেম এবং সাউথ এশিয়া সলিডারিটি গ্রুপ-এর কার্যক্রমে সক্রিয়।

*২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে গোয়ায় লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এর ইন্ডিয়া সামিটে স্রদা পোপোভিচ্ এবং যোগেন্দ্র যাদব।*

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে 'লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স'-এর স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা 'লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স'-র ছাত্র করণ কাটারিয়ার বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার চালানো হয়েছিল, তার নেতৃত্বেও ছিলেন সেই একই মুকুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ও (প্যামফ্লেট ব্যবহার করে ক্যাম্পাসে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হয়। কাটারিয়াকে একজন 'চরমপন্থী হিন্দু' হিসেবে আখ্যা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

**উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মুকুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন যোগেন্দ্র যাদবের স্ত্রী মধুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন।**

এর অর্থ হলো, ভারতে যখনই 'অহিংস আন্দোলন', 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার', 'ফ্যাসিবাদী মোদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ' বা এ ধরনের অন্য কোনো স্লোগানের আড়ালে কোনো নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়, তখন সেই আন্দোলনের প্রকাশ্য মুখ যেই হোক না কেন, যোগেন্দ্র যাদব এবং তাঁর মতো ব্যক্তিরাই পর্দার আড়ালে মূল ভূমিকায় থাকেন।

২০২৬ সালের মে মাসের শেষদিকে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যোগেন্দ্র যাদব ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে সার্বিয়ার 'লাফটিভিজম' (Laughtivism) এবং 'ডিলেমা অ্যাকশন' (Dilemma Action) কৌশলের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ক্যানভাস (CANVAS)-এর অন্যতম প্রধান কৌশলবিদ স্রদা পোপোভিচ্ যখন ভারত সফরে আসেন, তখন তাঁকে আমন্ত্রণ ও আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল 'লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স' ইন্ডিয়াকে। এই সফরে পোপোভিচ যোগেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘ আলোচনা করেন।

সেই আলোচনায় পোপোভিচ আন্দোলনের তিনটি মূল নীতির কথা ব্যাখ্যা করেনঃ

- আন্দোলনের ব্যক্তিকরণ: আন্দোলন এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ মনে করেন যে এই সংগ্রামটি তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
- প্রবেশের বাধা যত কম: আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া এমন সহজ ও নির্ভয় হতে হবে, যাতে যে কেউ অনায়াসে অংশ নিতে

পারে—যেমন শুধু একটি মিম শেয়ার করা বা কোনো দেওয়ালে গ্রাফিতি আঁকার মতো ছোট কাজের মাধ্যমেও।

- ভার্চুয়াল থেকে বাস্তবের যাত্রা: সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন, ভিউ বা অনলাইন অংশগ্রহণকে ধাপে ধাপে বাস্তব মাঠপর্যায়ের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকে রূপান্তরিত করা।

সিজেপি বা ককরোচ জনতা পার্টির-র কার্যপদ্ধতি খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, তারা মূলত জিন শার্প (Gene Sharp) এবং শ্রদ্জা পোপোভিচের 'লাফটিভিজম' মডেলেই অনুসরণ করেছে।

যখন যোগেন্দ্র যাদব 'লাফটিভিজম'-এর ধারণা এবং কীভাবে হাস্যরসকে কার্যকর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছিলেন, তখন অভিজিৎ দীপকে আম আদমি পার্টির যুবসমাজ-কেন্দ্রিক, মিম ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপনির্ভর সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

জনসংযোগ বিষয়ে পড়াশোনা করতে যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে অভিজিৎ দীপকে, আম আদমি পার্টির সোশ্যাল মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছিলেন। এছাড়া তিনি আপ নেতা ও দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন।

আম আদমি পার্টি এবং/অথবা বর্তমানে বা অতীতে যাঁদের সঙ্গে এই দলের সম্পর্ক ছিল, তাঁরা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিভিন্ন আলোচনায় বারবার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় উঠে এসেছেন।

কেননা অনেক বিদেশী শক্তিই চায়নি যে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ক্ষমতায় আসুক। তবে পরিবর্তনের পক্ষে জনসমর্থনের জোয়ারে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসেন। কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউপিএকে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আনার উদ্দেশ্যে বিদেশী ও অভ্যন্তরীণ নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেই জনরায় পরিবর্তিত হয়নি।

বিদেশী 'টুলকিট'-এর প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখা যায় ২০১৯–২০২০ সালের সিএএ-বিরোধী আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনের সময়। ইডি-র তদন্তে উঠে আসে যে, আপ-এর সঞ্জয় সিংহ-সহ কয়েকজন বিরোধী নেতার সঙ্গে বর্তমানে নিষিদ্ধ পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (PFI) এবং এমন কিছু নেটওয়ার্কের যোগাযোগ ছিল, যাদের বিরুদ্ধে ভারতে অরাজকতা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অর্থ সরবরাহের অভিযোগ ওঠে।

এটিও উল্লেখযোগ্য যে, যোগেন্দ্র যাদব সিএএ-বিরোধী আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলন—উভয় ক্ষেত্রেই সামনের সারিতে ছিলেন। ওই সময় তিনি স্রদা পোপোভিচের কৌশলগত মডেল বা playbook-এর বাস্তব প্রয়োগ ও পরীক্ষামূলক ব্যবহার (beta-testing) তদারকি করছিলেন। সিএএ-বিরোধী আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলন—দুটি ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত সহিংসতার ঘটনা ঘটে, যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন (regime change) ঘটানো সম্ভব হয়নি।

*দিল্লি দাঙ্গায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জেলবন্দী উমর খালিদের সঙ্গী বনজ্যোৎস্না লাহিড়ীর সঙ্গে 'আরশোলা নেতা' সৌরভ দাস।*

মোদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টা থেমে যায়নি। বরং এর পর শুরু হয় নৈরাজ্যবাদী কৌশলপুস্তকের (anarchist playbook) দ্বিতীয় ধাপ—বর্ণনা বা আখ্যান নির্মাণ (narrative building)।

আম আদমি পার্টি থেকে কংগ্রেস পর্যন্ত বিজেপি-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি বিদেশী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করেছে। আর এই সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় সংযোগসূত্র হিসেবে ছিলেন যোগেন্দ্র যাদব।

কৃষক আন্দোলন এবং চলমান সিজেপি (CJP)-এর প্রতিবাদের মধ্যবর্তী সময়ে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল মোদী সরকারের বিরুদ্ধে জনসমর্থন গড়ে তোলা। এই যাত্রায় যোগেন্দ্র যাদবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, রাহুল গান্ধী এবং তাঁর দল একাধিকবার ভারতের গণতন্ত্র 'হুমকির মুখে' রয়েছে—এই যুক্তি তুলে ধরে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

বহু বছরের প্রশিক্ষণ, নির্দিষ্ট narrative গড়ে তোলা এবং ভারতে অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা প্রবাহিত করার যে প্রক্রিয়া হয়েছিল তারই পরিণতি হিসেবে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র উত্থান ঘটে। ওয়াকফ-বিরোধী আন্দোলনগুলিতে সহিংসতা ও অরাজকতার ঘটনা ঘটলেও, বিষয়টি মূলত মুসলিম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে হওয়ায় সেটিকে বৃহত্তর গণআন্দোলনের সূচনাবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি এবং তা ব্যাপক জনসমর্থনও অর্জন করতে পারেনি।

তবে, ১৫ মে ২০২৬-এ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে করা একটি মন্তব্যকে সেই সম্ভাব্য সূচনাবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওই মন্তব্যে তিনি বলেছিলেন, যেসব তরুণ-তরুণী নিজেদের পেশায় কর্মসংস্থান খুঁজে পান না, তারা "আরশোলার মতো" আরটিআই (RTI) আন্দোলন, সোশ্যাল মিডিয়া ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং "সমাজের পরজীবী" হয়ে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান।

আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যটি শুধুমাত্র ভুয়ো ডিগ্রিধারীদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। তবুও অভিজিৎ দীপকে সেই "অপমান"-কেই ভারতীয় যুবসমাজের বিরুদ্ধে অপমান হিসেবে তুলে ধরে সেটিকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেন। তিনি যুবকদের অনিশ্চয়তা, ক্ষোভ ও অসন্তোষকে উসকে দিয়ে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির রূপ দেন। দীপকে একটি ইনস্টাগ্রাম পেজ তৈরি করেন, যা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ২ কোটিরও বেশি ফলোয়ার অর্জন করে।

সিজেপি (CJP) তাদের ওয়েবসাইট চালু করে এবং প্ল্যাটফর্মটিকে জেন-জি (Gen-Z)-এর কাছে আকর্ষণীয় ও 'কুল' করে তুলতে সদস্যপদের জন্য নানা শর্ত তুলে ধরে, যেমন—'বেকার', 'অলস', 'সারাক্ষণ অনলাইনে থাকা' (chronically online) এবং 'পেশাদারের মতো অভিযোগ করতে সক্ষম' (rant professionally) হওয়া। এরপর সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও বেশি সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিজেপি #MainBhiCockroach হ্যাশট্যাগ চালু করে। 'আরশোলা' অপমানকে তারা একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করে এবং সেটির সঙ্গে তথাকথিত 'বিপ্লবী' অর্থ জুড়ে দেয়।

*"আরশোলাদের আন্দোলনে" রাহুলের প্রতিবাদী আবির্ভাব।*

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সিজেপির সামাজিক মাধ্যমের পেজগুলো ভাইরাল হয়ে যায়। তাদের নিজস্ব একটি উইকিপিডিয়া পেজও তৈরি হয় এবং সংবাদমাধ্যমে এটি 'যুবকেন্দ্রিক নতুন কুল ট্রেন্ড' হিসেবে ব্যাপক প্রচার পেতে শুরু করে। সিজেপি (CJP)-র ইশতেহারে বিরোধী দলগুলির প্রায় সমস্ত প্রধান বক্তব্যই স্থান পেয়েছিল। সেখানে বিচারব্যবস্থার সংস্কারের দাবি জানিয়ে বলা হয়, কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) যেন অবিলম্বে রাজ্যসভার আসন বা সরকারের কোনো পদ না পান।

নির্বাচনী স্বচ্ছতার অজুহাতে সিজেপি দাবি করে, কোনো নাগরিকের বৈধ ভোট যদি বিনা কারণে বাতিল করা হয়, তাহলে সরাসরি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইউএপিএ প্রয়োগ করা হবে। এই বক্তব্য মূলত SIR এবং বিরোধীদের উত্থাপিত 'ভোট চুরি' অভিযোগকে সামনে রেখেই দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়াও, CJP প্রতিশ্রুতি দেয় যে আদানি বা আম্বানির মতো কর্পোরেট গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যমগুলোর লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এটিও বিরোধীদের বহুল প্রচারিত 'গোদি মিডিয়া' বয়ানের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সিজেপি -র ইশতেহার, তাদের বিভিন্ন দাবি এবং আন্দোলনের কৌশল—সবই এমনভাবে পরিকল্পিত, যাতে মোদি সরকারকে স্রদজা পোপোভিচ তত্ত্বায়িত তথাকথিত 'দ্বিধার ফাঁদে' (dilemma of action) ফেলে দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, সিজেপি আন্দোলনের প্রধান নেতারা দীর্ঘদিন ধরেই মোদী সরকারের আদর্শগত বিরোধী হিসেবে পরিচিত। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে AAP-এর একজন প্রাক্তন পদাধিকারী।

সিজেপির প্রধান মুখপাত্র, সাংবাদিক সৌরভ দাস, দীর্ঘদিন ধরেই মোদি-বিরোধী প্রচার চালিয়ে আসছেন। তিনি ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার অভিযুক্ত উমর খালিদের একজন সমর্থক হিসেবেও পরিচিত। এছাড়াও, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে দূষণবিরোধী আন্দোলনের সময় যারা মাওবাদ-সমর্থক স্লোগান তুলেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে, সেই তথাকথিত 'আরবান নকশাল'দের প্রতিও তিনি সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। বিজেতা দাহিয়া একসময় জার্মানিভিত্তিক ইউটিউবার এবং বিজেপিবিরোধী প্রচারের জন্য পরিচিত ধ্রুব রাঠী-র জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতেন। এছাড়াও, তাঁর বিরুদ্ধে অতীতে হিন্দুবিদ্বেষী মন্তব্য করার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

'লাফটিভিজম' (Laughtivism) এবং CANVAS-এর কৌশলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো হাস্যরস এবং সরকারের জন্য 'যেদিকেই যাক, ক্ষতি' (lose-lose) ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা। এই কৌশল অনুযায়ী, সরকার যদি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেয়, তবে সরকারকে দুর্বল হিসেবে দেখানো হবে, আন্দোলনকারীরা প্রাধান্য পাবে এবং সরকারকে বড় ধরনের ছাড় দিতে বাধ্য হতে হবে—অথবা নেপাল ও বাংলাদেশে যেমন সরকার পরিবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তেমন অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে। অন্যদিকে, সরকার যদি CJP-র নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করে, তাহলে তাকে এমন এক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরা হবে, যা নির্মমভাবে আন্দোলন দমন করতে চায়। এর ফলে দিল্লির ভেতরে ও বাইরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।

CJP ইতিমধ্যেই AAP-এর সমর্থন পেয়েছিল; বরং বলা যায় যে এটি AAP, সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য বিজেপিবিরোধী সংগঠনের একটি 'বি-টিম'। এখন তারা পাকিস্তানের কিছু মহল এবং Sikhs for Justice-এর মতো খালিস্তানপন্থী সংগঠনগুলির সমর্থনও আকর্ষণ করছে।

একটি 'আর-বা-পার-এর লড়াই'-এর পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মোদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে। তবে, এই ভারতীয় সংস্করণের নৈরাজ্যবাদী 'লাফটিভিজম' (laughtivism) এখনও পর্যন্ত এমন জনসমর্থন অর্জন করতে পারেনি, যা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ভোটদানের ধরণে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে বা সহিংস উপায়ে সরকার পরিবর্তনের ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে।

# জনতার দরবারে জননেতা

**নুপুর মুখার্জী**

**দুঃখী মানুষের আর্ত মানুষের পাশে সমস্ত সমবেদনা নিয়ে দাঁড়ানোই ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাষ্ট্রবাদী সরকার যে এই সনাতন সংস্কৃতির উপযুক্ত ধারক ও বাহক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর "জনতার দরবার" সেটা প্রমাণ করে দেখালো। "জনতার দরবার" আসলে জনসেবার প্রতিফলন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রতিফলন। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের দর্শনের প্রতিফলন।**

গণতন্ত্র সম্বন্ধে তিনটি মৌলিক কথা বহুদিন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মুখে মুখে ঘোরে, কথা তিনটি হল মানুষেরই গণতন্ত্র মানুষের দ্বারাই গণতন্ত্র ও মানুষের জন্যই গণতন্ত্র। কথাটা তত্ত্বগতভাবে ঠিক কারণ গণতন্ত্রের ভরকেন্দ্র যে আমজনতা বা দেশের সাধারণ নাগরিক এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রয়োগের জায়গায় এই সহজ কথাটা অতটা সহজে আর মেলানো যায় না, সেখানে মানুষের কণ্ঠস্বর প্রশাসনের উপরের তলায় গিয়ে পৌঁছায় না। আমলাতন্ত্রের যান্ত্রিক কাঠামো মানুষের চোখের জলকে অনেক সময় তেমন মূল্য দেয় না অথচ মানুষ সরকারি কাঠামোর মধ্যে একটুখানি হৃদয় আশা করে। আশা করে তাদের আশা আকাঙ্খা বা সমস্যাগুলো সর্বস্তরে অনেকখানি মমত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। তা না হলে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ গোপনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং তা একদিন বিবিধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিস্ফারিত হয়। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কোথায়? কিভাবে মাটির কাছাকাছি মানুষ ও সরকারি শাসন যন্ত্রের মধ্যকার এই ব্যবধান কে দূর করা যাবে? এর একমাত্র উপায় হল শিখরে যিনি আছেন তাকে ক্ষমতার শীর্ষ থেকে মানুষের কাছে মাটির স্তরে নেমে আসতে হবে।

অতীতে এই ভারত ভূমিতেই স্বয়ং রাজা সাধারণ মানুষের ছদ্মদেশে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন,শুধু নিজের চোখে মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবিটা দেখার জন্যে ও নিজের কানে তাদের হতাশাটুকু শোনার জন্য। এ আমাদের ভারতবর্ষীয় শাসন পদ্ধতির এক মমত্বপূর্ন ঐতিহ্য পরম্পরা। এই ঐতিহ্য পরম্পরার এক উজ্জ্বল উদাহরণ আমরা দেখতে পেলাম সদ্য নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের মধ্যমণি মুখ্যমন্ত্রী সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়-এর সাম্প্রতিক "জনতার দরবার" কর্মসূচির মধ্যে।

বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে বঞ্চনা, দুর্নীতি আর প্রশাসনিক উদাসীনতার শিকার হয়েছেন সেই ভয়ের মেঘ কাটিয়ে আলোর দিশা দেখানোর জন্য তিনি নিজেই এসেছেন মানুষের কাছে মানুষের মাঝে। আমরা দেখলাম কত সহজ ভাবে দুঃখী আত্মবিপন্ন মানুষের মুখোমুখি বসে কত আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের কথা শুনছেন। শুধু তাই নয় কত দ্রুত তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ও দীর্ঘদিনের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করছেন পরম বন্ধুর মতো। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা শ্রীমদ্ভগবতের শ্রীকৃষ্ণের মত এবং এই সহজ প্রীতি হলো তার প্রসিদ্ধ সখ্যভাব এই নজির এর আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখিনি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে প্রতি সোমবার "জনতার দরবার" কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। আমরা দেখেছি এই দরবারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে হাজির হয়ে চলেছেন। বহু দরিদ্র পরিবারের বাবা মা বা সদস্যরা তাদের সন্তান বা আত্মীয়দের জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার বিশাল খরচ বহন করতে না পেরে আর্থিক অনুদানের জন্য কাতর আর্জি জানাচ্ছেন।

যেমন কলকাতার ধাপা মাঠপুকুর এলাকার বাসিন্দা করুণা বাউরী ও তার স্বামী বাহাদুর বাউরী তাদের ৯ বছর বয়সী মেয়ে আরোহীর একটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল শারীরিক সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। করুণা দেবীর স্বামী একজন দিনমজুর হওয়ায় চিকিৎসার এই বিশাল খরচের মুখে তারা সম্পূর্ণ

অসহায় হয়ে পড়েন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাউরী দম্পতিকে আশ্বস্ত করে স্পষ্ট জানান ছোট্ট আরোহীর চিকিৎসার জন্য সমস্ত খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে এবং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের নোডাল আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তা কার্যকরী করার জন্য।

ঠিক এইরকমই শুভজিৎ রায়ের পাঁচ বছরের ছেলে সৌমজিৎ জন্ম থেকেই গুরুতর লিভারের অসুখে (লিভার সিরোসিস )আক্রান্ত। সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে এবং ডাক্তার বাবুরা জরুরী ভিত্তিতে লিভার প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। শুভজিৎ বাবু দরবারে চিকিৎসার খরচের জন্য আর্থিক সাহায্যের কাতর আবেদন জানান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সৌম্যজিতের মেডিকেল ফাইল নিজে খতিয়ে দেখেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে শিশুটির লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য দশ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেন ও পরবর্তী চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বিষয়টি নজরে রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া আমরা জানতে পারি স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের পৈত্রিক ভিটেমাটি বা জমি, জোরপূর্বক জবরদখল ও সিন্ডিকেটরাজের ভুরিভুরি অভিযোগ আসছে। যেমন হাইল্যান্ড পার্কের এক প্রবীণ চিকিৎসক অভিযোগ করেন যে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি ৬ বছর ধরে তাদের পৈত্রিক ভিটে জুলুমবাজি করে কেড়ে রেখেছে আবার কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা ৮১ বছর বয়সী প্রবীর মুখোপাধ্যায় প্রোমোটার ও ভূমি মাফিয়াদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে পৈত্রিক সম্পত্তি হারানোর চরম দুর্দশার বিবরণ মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। এক্ষেত্রেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের জমি সংক্রান্ত ও ফৌজদারি অভিযোগগুলি সরাসরি অন স্পট নোডাল পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দ্রুত তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এছাড়া সরকারি ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কর্মসংস্থান ও বদলি সংক্রান্ত সমস্যার অভিযোগের তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখেছি পিজি হাসপাতালের ১৫ বছরের অভিজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক কাউন্সিলর রূপা চক্রবর্তী অনৈতিকভাবে বদলির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানানোর ১২ ঘন্টার মধ্যে স্বাস্থ্য ভবন থেকে নির্দেশিকা জারি হয় তাকে পুনরায় পিজি হাসপাতালের পুরনো পদে পুনরবহাল করার জন্য।

এছাড়া আমরা দেখেছি বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর এবং পুরনো খুনের মামলার অভিযোগ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা হাজির হয়েছেন এই দরবারে ।যেমন ২০১২ সালের ৫ই জুলাই সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ঘটনার ১৪ বছর কেটে গেলেও পরিবারটি এখনো চূড়ান্ত ন্যায় বিচার পায়নি। বিচারের আশায় বরুণ বিশ্বাস এর দিদি প্রমিলা রায় এবং দাদা অমিত বিশ্বাস জনতার দরবারী মুখ্যমন্ত্রী মুখোমুখি হন এছাড়া ২০১১ সালের জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে খুন হন বালির পরিবেশ কর্মী ও তৎকালীন তৃণমূল নেতা তপন দত্ত। তার স্ত্রী প্রতিমা দত্ত স্বামীর হত্যার প্রকৃত বিচার ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে দরবারে হাজির হন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত খুনের মামলাগুলির ক্ষেত্রে নতুন করে সিট গঠন করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেন। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা বা প্রভাব খাটানোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং ফাস্ট ট্রাক কোর্টের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন।

চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ দুর্নীতি ও মেধা তালিকার বঞ্চনার শিকার হয়ে শয়ে শয়ে মানুষ ভিড় করেছেন সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনেছেন এবং বিষয়টি আইনি জটিলতার সঙ্গে যুক্ত থাকায় শিক্ষা ও কর্মসংস্থান দপ্তরে আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ রিভিউ সেল গঠন করা নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আদালতের নিয়ম মেনে যোগ্যরা দ্রুত নিয়োগ হতে পারেন।

এছাড়া পুরসভা ও স্থানীয় নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথা শুনে তিনি সরকারের তরফে Swachha App চালু করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। যেখানে ভূ-ট্যাগিং-এর মাধ্যমে আবর্জনা বা জল জমার ছবি তুলে পাঠালে পুরপ্রশাসন সরাসরি তা সমাধান করতে বাধ্য থাকবে। এমন কি আমরা দেখেছি সংগীত শিল্পী ঋদ্ধি বন্দোপাধ্যায়-এর সাথে দোলা মুখোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানান। পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে এক প্রভাবশালী চক্রের কারণে তাদের এবং অনেক শিল্পীকে বিগত ১২-১৩ বছর ধরে কোন সরকারি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। একটা ব্যান্ প্রথা চালু ছিল। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাবে তাদের আশ্বস্ত করে জানান যে আর কোন শিল্পীকে রাজনৈতিক কারণে বা ব্যক্তিগত আক্রোশে নিষিদ্ধ বা বয়কট করার নোংরা সংস্কৃতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিভার ভিত্তিতে রাজ্যের সমস্ত শিল্পীদের কাজ করার পূর্ণ সুযোগ তারা পাবেন।

কিছু নমুনা আমি তুলে ধরলাম আপনাদের কাছে এরকম অজস্র সমস্যা নিয়ে মানুষ আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার আন্তরিকতা, সমাধানের জন্য ইচ্ছা শক্তি এবং মানবিক রূপ আমাদের কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইল।

এত কিছু দৃষ্টান্ত দেখানোর পর শেষ করব একটি গভীর কথা বলে। একটি রাষ্ট্রে বিশেষ করে একটি কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভিত্তিটা দাঁড়িয়ে থাকে জনগণ ও প্রশাসনের পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর জনতার দরবার এই যৌথ বিশ্বাস গঠনের পথে এক সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই প্রশাসনিক উদ্ভাবন তাই শুধু এই রাজ্যে নয় সারাদেশের কাছেই এক অনুসরণযোগ্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আক্ষপ করেছিলেন যে যেখানে 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।' । সেই আত্মদ্বন্দ্বে ও আক্ষেপের উত্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই স্পর্শযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে। দুঃখী মানুষের আর্ত মানুষের পাশে সমস্ত সমবেদনা নিয়ে দাঁড়ানোই ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাষ্ট্রবাদী সরকার যে এই সনাতন সংস্কৃতির উপযুক্ত ধারক ও বাহক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর "জনতার দরবার" প্রমাণ করে দেখালো। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমরা এই কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

# তসলিমার প্রত্যাবর্তন

মোহিত রায়

তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে ইসলামী ফতোয়া মেনে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি চর্চার অবসান। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দু বৌদ্ধদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সমর্থন। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে মুসলমান মহিলাদের স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রগতি। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা সংস্কৃতির অবসানের পক্ষে প্রতিবাদ আরো সোচ্চার হওয়া। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে বাম লিবারেল ভণ্ড সেকুলারদের দিবা অবসান।

১ আগস্ট, রবীন্দ্র সদন কলকাতা। তিলধারণের জায়গা নেই। এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যা। মঞ্চে তসলিমা নাসরিন। অবশেষে তিনি ফিরলেন বাংলায়। পশ্চিমবাংলায়। যে বাংলায় তাঁর প্রিয় শহর কলকাতায় তিনি ফিরতে চেয়েছেন বারবার কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। অবশেষে তিনি ফিরলেন। পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন ভোরের সূচনা হল। স্বাগত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে যিনি এই নতুন যুগ শুরু করার প্রধান কাণ্ডারী।

সেদিন সন্ধ্যার রবীন্দ্রসদন কোনও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ, সরকারি অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় দলের সভা মঞ্চ ছিলনা। সাহিত্যিকদের বাসরও ছিলনা। এ ছিল এক কবির পাশে দাঁড়ানোর মঞ্চ। কবিকে সম্মান জানাতে এ ছিল কবি-লেখক- চিন্তাবিদদের মঞ্চ। উপস্থিত ছিলেন আমাদের সবার অভিভাবকসম সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু ও বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাসের আকর গ্রন্থ রচয়িতা শ্রী তথাগত রায়, শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত যিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে তসলিমা ও অন্যান্য নিপীড়নের সাংবাদ পৌছে দিয়েছেন বহির্বঙ্গে, শ্রীমতী শাশ্বতী ঘোষ নারীবাদী লেখক যিনি গত দুদশকের বেশি ধরে তসলিমার চিন্তার পক্ষে লিখে যাচ্ছেন এবং শ্রী বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর ঈর্ষণীয় সাহিত্য প্রতিভা সনাতনী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

২০২০র নভেম্বরের এক অপরাহ্নে অতিমারীর আশঙ্কাকে সরিয়ে রেখে পথে নেমেছিলেন কলকাতার অনেক মানুষ একজন অভিনেতার শেষযাত্রায়। দূরদর্শনের পর্দায় তা দেখে অভিভূত এক সাহিত্যিক কবি তসলিমা নাসরিন। তাঁর ফেসবুকে লিখলেন –"কবিতা পড়ে, গান গেয়ে, ফুলে ফুলে সাজিয়ে, চোখের জলে ভিজিয়ে প্রিয় শিল্পীকে যেভাবে বিদায় দিল কলকাতা – তার তুলনা হয় না।" আরো অনেক প্রশংসা। এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার নিবন্ধে আমি লিখেছিলাম সত্যিইতো এই মহানগরে, এই রাজ্যে, শিল্পীর, সংস্কৃতির এত সম্মান, তা ঢাক বাজিয়ে, বুক ফুলিয়ে আমরা প্রায়শঃই বলেও থাকি। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন তসলিমা, আপনি কেন মিছিলে ছিলেন না, কেন আপনি নির্বাসিতা? কারণ ওই মিছিলে বাংলা শিল্প সাহিত্যের ছোটবড় সব তারকারাই ছিলেন এবং সবাই আপনার বিতাড়নে কমবেশী জড়িত। প্রাথমিক কিছু প্রতিবাদ হলেও পরে সবাই শরিয়ত মান্য শিল্প সাহিত্য রচনায় মগ্ন থেকেছেন। যে কারণে রবীন্দ্রসদনে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক লগ্নে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানোর মতন বুদ্ধিজীবী বিশেষ পাইনি, আমরা এদের মধ্যে ভালো খারাপ খোঁজার ঝুঁকি নিতে চাই নি।

অনেকে বলছেন আমরাই বা কারা, হঠাত সরকার বদলে জেগে ওঠা কিছু তসলিমা প্রেমী সুযোগ সন্ধানী। সে প্রসঙ্গে বলি কবি তসলিমাকে নিয়ে এই উদ্যোগের প্রাণপুরুষ ওসমান গনি মল্লিক তসলিমা নাসরিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত, গত দু দশক ধরে মুসলিম সমাজে মুক্ত চিন্তার কাজ করে যাচ্ছেন। শান্তনু সিংহ সনাতনী সংস্কৃতির প্রসারে পরিচিত নাম। মোহিত রায়, আমার সঙ্গে, তসলিমা নাসরিনের সরাসরি পরিচিতি ২০০৫ সালের অক্টোবরে। ইতিমধ্যে তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে লজ্জা উপন্যাস লিখে ইসলামী মৌলবাদী ও সব রাজনৈতিক দলের বিরোধিতায় বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত। দশ বছর ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে বড় আশা নিয়ে ফিরেছেন বাম ধর্মনিরপেক্ষ বাম শাসিত পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তখনো বাংলাদেশের নৃশংস হিন্দু বিতাড়ন নিয়ে বিশেষ জানতেন না। এসময় আমরা বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে দু দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন করি কলকাতায়। এব্যাপারে আজ বিশেষভাবে স্মরণ করছি প্রয়াত অচিন্ত্য গুপ্ত ও কবি কমলেশ সেনকে। সেখানে ছিলেন শিবনারায়ণ রায়, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দে, আমেরিকা ইউরোপ থেকে বাংলাদেশী প্রতিনিধিরা, চাকমা নেতা উষাতন তালুকদার, বাংলাদেশের খ্রিস্টান নেত্রী রোজালিন কোস্টা, বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তিত্ব রাণা দাশগুপ্ত, ফ্রান্সিস গতেয়ার, তথাগত রায়, এশা দে। না কোন সংবাদপত্র একটি লাইনও লেখে নি। ২০০১ সালে বরিশালের চর

ফ্যাসনে যখন তিনদিন ধরে আটশ হিন্দু নারীর সম্ভ্রমহানি হচ্ছিল তখন কলকাতায় বরিশালের কবি, পশ্চিমবঙ্গের বিবেক বলে প্রায় প্রতিষ্ঠিত কবি, বিদেশী আক্রমণকারী বাবরের দুঃখে বাবরের প্রার্থনা লিখছেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা ক্রমশঃ এই সাংস্কৃতিক কৃষ্ণ গহ্বরে প্রবেশ করেছি। এ বাংলার প্রতিবন্ধী ঐতিহাসিক, সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবীরা নীরব থাকলেও বাংলাদেশের এই বীভৎস রূপ আমাদের জানাচ্ছেন অর্থনীতিবিদ আবুল বরকত, ঐতিহাসিক মুনতাসির মামুন, লেখক শাহরিয়ার কবীর।

বাম ইসলামী মহাবন্ধন তসলিমার বসবাস বেশিদিন হতে দেয় নি। ২২ নভেম্বর ২০০৭-এ কলকাতা থেকে বিতাড়িত হন তসলিমা নাসরিন। বিতাড়নের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ইসলামি মৌলবাদীরা মেদিনীপুর শহরে তাঁকে কবিতা পড়তে দেয়নি, শিলিগুড়ির বইমেলায় যেতে দেয়নি। কলকাতা শহরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম তসলিমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন, তাঁর বিতাড়নের দাবিতে ইদ্রিস আলি- সিদ্দিকুল্লারা শহরে জমায়েত করে হুমকি দেন; তখন মার্কসবাদী মহম্মদ সেলিম থেকে হান্নান মোল্লারা একে নীরব সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। এই সবের পক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী সমাজের নীরব সমর্থন এবং ২১ নভেম্বর ২০০৭ কলকাতার ক্ষুদ্র একটি অংশের দাঙ্গা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা-ছাড়া করল। এই বিতাড়নে সমর্থনের কথা আগেই মাদ্রাসা ছাত্রদের সভায় জানিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিতাড়নের পর বামফ্রন্ট নেতা বিমান বসু বললেন, তসলিমা নাসরিনের নিজেরই চলে যাওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২১ নভেম্বরের হিংসাকে বললেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো। শিল্প-সংস্কৃতির শহর বলে বিজ্ঞাপিত কলকাতা জানাল, আসলে এ শহরের ও বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি হতে হবে শরিয়ত মান্য। এ মহানগরের নাগরিকদের এত বড় লজ্জার মুখোমুখি আগে কখনও হতে হয়নি।

সবাই চুপ থাকে নি। তিনদিন পরে ঐ দাঙ্গার ঘটনাস্থল পার্ক সার্কাসে প্রতিবাদ করতে সমবেত হয়েছিলাম আমরা কয়েকজন। বছরের পর বছর আমরা অনেকে মিলে ২১শে নভেম্বর লজ্জা দিবস পালন করেছি, প্রেস ক্লাবে সভা করেছি। এর মধ্যে সরকার বদল হলো, বাম গিয়ে এল তৃণমূল কংগ্রেস। ইসলামী মৌলবাদী শাসন আরো চেপে বসলো। হতাশ হয়ে দেখলাম যারা একদা তসলিমার পক্ষে বলতেন তাঁরা হয়ে গেলেন নতুন সরকারের পোস্টার বয়। কেউ তসলিমার ফেরার কথা মুখেও আর তোলেন না। অনেকে আজকে নিজেদের ভুল স্বীকার করে বলছেন যে তসলিমার ফেরার কথা না বলাটা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু অন্যায় শুধু সেটুকু নয় তাঁরা সবাই পশ্চিমবঙ্গে একটি ইসলামী মৌলবাদ সমর্থক সরকারের প্রায় অংশ হিসাবে কাজ করেছেন। তসলিমা নিয়ে নীরব থেকেছেন গেরুয়াবসনধারী দিব্য জ্ঞানীরাও।

দু'মাস হলো পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার এসেছে। মনে হচ্ছে, একটা নতুন মুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ। আমরা যারা তসলিমা নাসরিনের লড়াইয়ের সঙ্গে, তাঁর এই মুক্ত চিন্তার পক্ষে, লেখকের স্বাধীনতার পক্ষে, গত ২৫ বছর ধরে ছিলাম সেরকম কয়েকটা সংগঠন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি জগতের দুই দশকের কালিমালিপ্ত অতীতের অবসান। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে লেখকের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে ইসলামী ফতোয়া মেনে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি চর্চার অবসান। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দু বৌদ্ধদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সমর্থন। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে মুসলমান মহিলাদের স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রগতি। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা সংস্কৃতির অবসানের পক্ষে প্রতিবাদ আরো সোচ্চার হওয়া। তসলিমার প্রত্যাবর্তন মানে বাম লিবারেল ভণ্ড সেকুলারদের দিবা অবসান। পৃথিবীর আর কোন শহর তার রাস্তায় রাস্তায় বিশাল হোর্ডিং টাঙ্গিয়ে জানাতে পারে যে একজন কবি ফিরছেন। তিনি এসে গেছেন। আমরা এই ঐতিহাসিক দিনটির অংশীদার হয়ে গর্বিত।

কিন্তু তসলিমা নাসরিনের পথচলা এখানেই শেষ নয়, আমাদের অনেকেরও নয়। তসলিমাকে ফিরতে হবে বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে।

"আমার জন্য অপেক্ষা করো মধুপুর নেত্রকোনা
অপেক্ষা করো জয়দেবপুরের চৌরাস্তা
আমি ফিরব। ফিরব ভিড়ে হট্টগোল, খরায় বন্যায়
অপেক্ষা করো চৌচালা ঘর, উঠোন, লেবুতলা, গোল্লাছুটের মাঠ
আমি ফিরব। পূর্ণিমায় গান গাইতে, দোলনায় দুলতে, ছিপ ফেলতে বাঁশবনের পুকুরে-"

**(তবু ফিরব – তসলিমা নাসরিন)**

# 'ডবল ইঞ্জিন' মডেলে বাংলার অর্থনৈতিক পুনরুত্থান

# সদিচ্ছা থাকলে সম্ভব স্বপ্নপূরণ

**সোমনাথ গোস্বামী**

**২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এই বাজেট পশ্চিমবঙ্গকে একটি নতুন অর্থনৈতিক দিশা দেখিয়েছে। খয়রাতি তোষণের রাজনীতি থেকে সরে এসে উৎপাদনশীল অর্থনীতি, স্থায়ী কর্মসংস্থান, এবং কঠোর রাজকোষ শৃঙ্খলার এই সুষম ভারসাম্যই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকে একটি আধুনিক, স্বনির্ভর এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলবে।**

অর্থনীতির চিরাচরিত ব্যাকরণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে রাজ্যটি বছরের পর বছর কেবল রাজনৈতিক আবেগের সমীকরণে পথ চলেছে, তার অবরুদ্ধ রাজকোষে অবশেষে এক দীর্ঘস্থায়ী মিথ ভেঙে যাওয়ার সুর শোনা গেল। দশকের পর দশক ধরে বাংলার নীতিনির্ধারক ও বাম-ডানপন্থী অর্থনীতিবিদদের একাংশ একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে অবিচল ছিলেন—ভোটের রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে যে বিপুল নগদ হস্তান্তরের প্রয়োজন, তার ধাক্কায় অনিবার্যভাবে রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে; অথবা সেই জনমোহিনী খয়রাতের চড়া মূল্য চোকাতে হবে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে।

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য পেশ করা নিট ৪,৩৮,৭৭৫.২৯ কোটি টাকার নতুন রাজ্য বাজেট এই পুরনো ও স্থবির অপ-অর্থনীতিকে কেবল খণ্ডনই করেনি, বরং গাণিতিকভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে—কঠোর রাজকোষ শৃঙ্খলার বেড়ি না ভেঙেও সামাজিক সুরক্ষার হাতকে বহুগুণ শক্তিশালী করা সম্ভব। তবে এই নাটকীয় রূপান্তর কোনো অলৌকিক জাদুবলে ঘটেনি; এর পেছনে কাজ করেছে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর সম্পূর্ণ নতুন এক সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল, যা রাজ্যের নিজস্ব রাজস্বের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় সহায়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করেছে।

এই নতুন বাজেট দর্শনের মূল চালিকাশক্তি হলো 'কেন্দ্রীয় আর্থিক সংহতি' (Central Fiscal Synchronization)। গত অর্থবর্ষে তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রের সঙ্গে লাগাতার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংঘাতের জেরে রাজ্যের আর্থিক কাঠামো এক গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। যার সরাসরি প্রমাণ মেলে গত বছরের সংশোধিত বাজেটের নথিতে, যেখানে কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া অনুদান ও সাহায্য (Grants-in-Aid) হ্রাস পেয়ে নেমে গিয়েছিল মাত্র ২২,০৬৮.৮৫ কোটি টাকায়। নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েই এই সংঘাতের পথ পরিহার করে এবং দিল্লির সঙ্গে পূর্ণ প্রশাসনিক সমন্বয় গড়ে তোলে। এর ফল মিলেছে হাতেনাতে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্রীয়

অনুদান ও সাহায্য একলাফে প্রায় ৪৯,৩২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭১,৩৯৩.১৯ কোটি টাকায়। কেন্দ্রীয় তহবিলের এই অভূতপূর্ব এবং রেকর্ড জোগানই রাজ্যকে কোনো নতুন ঋণের জালে না জড়িয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের মূলধনী শক্তি জুগিয়েছে।

**কেন্দ্রীয় অনুদান ও সাহায্য (Grants-in-Aid) তুলনামূলক চিত্র**

| পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের সংশোধিত | নতুন সরকারের ২০২৬-২৭ বাজেট |
|---|---|
| **২২,০৬৮.৮৫ কোটি টাকা** | **৭১,৩৯৩.১৯ কোটি টাকা** |

এই অতিরিক্ত ও নিশ্চিত রাজস্ব প্রবাহের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে রাজ্যের সামগ্রিক ঘাটতির সূচকগুলির ওপর। ৮.১৬ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল পুঞ্জীভূত 'লেগাসি ঋণ' উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েও নতুন সরকার যেভাবে রাজকোষের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছে, তা এক কথায় নজিরবিহীন। প্রথমত, রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি (Revenue Deficit) গত বছরের সংশোধিত বাজেটের ৪১,১৬৪ কোটি টাকা থেকে প্রায় ১৯,১৮০ কোটি টাকা কমিয়ে ২১,৯৮৪ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে, যা জিএসডিপি-র (GSDP) মাত্র ১.০২%। দ্বিতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সামগ্রিক আর্থিক ঘাটতি বা ফিসকাল ডেফিসিট (Fiscal Deficit) পূর্ববর্তী বছরের ৩.৪০% থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে ২.৯১%-এ, যা এফআরবিএম (FRBM) আইনের বাধ্যতামূলক ৩ শতাংশের আইনি সীমার চেয়েও নিচে। তৃতীয়ত, ঋণ ও জিএসডিপি-র অনুপাত (Debt-to-GSDP Ratio) ৩৮.২৯% থেকে কমিয়ে ৩৭.৯৮%-এ নামানো সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, রাজকোষের দেউলিয়া দশা কাটানোর এই গাণিতিক লড়াইয়ে রাজ্যকে কোনো নতুন বাজারের ঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়নি।

**সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের রূপান্তর**
**(জিএসডিপি-র শতাংশে)**

| পূর্ববর্তী সংশোধিত বাজেট | নতুন ২০২৬-২৭ বাজেট |
|---|---|
| ফিসকাল ডেফিসিট: ৩.৪০% | ফিসকাল ডেফিসিট: ২.৯১% (FRBM) |
| রাজস্ব ঘাটতি: ২.০৭% | রাজস্ব ঘাটতি: ১.০২% |
| ঋণ-উৎপাদন অনুপাত: ৩৮.২৯% | ঋণ-উৎপাদন অনুপাত: ৩৭.৯৮% |

এই সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই সরকার তার সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিশ্রুতি—'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র রূপায়ণ নিশ্চিত করেছে, যার বার্ষিক বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে এক ঐতিহাসিক অংকে—৩৬,০০০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী সামাজিক কল্যাণ খাতে যেখানে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, নতুন বাজেটে সেই পরিধি ও আর্থিক কাঠামোকে ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। নতুন অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী সমস্ত যোগ্য মহিলার জন্য প্রতি মাসে

*ইস্পাত শিল্পে পুরুলিয়ায় ৪০০০ কোটির বিনিয়োগ।*

এককালীন সরাসরি বর্ধিত ৩,০০০ টাকা দেওয়ার আইনি গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প চালুর পর অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে, সামাজিক সুরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে পরিকাঠামো খাত অবহেলিত হবে। কিন্তু বাজেট গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছে যে, এই ৩৬,০০০ কোটি টাকার ব্যয়ভার কোনো অনুৎপাদক ঋণ নিয়ে করা হচ্ছে না, বরং কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ৪৯,৩২৫ কোটি টাকার গ্র্যান্ট-ইন-এইড এই সম্পূর্ণ সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের ব্যয়ভার অনায়াসে বহন করে নিচ্ছে। ফলে রাজ্যের নিজস্ব মূলধন অন্য বড় পরিকাঠামোয় ব্যবহার করার পথ সুগম হয়েছে।

সামাজিক কল্যাণকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি, এই বাজেট সমপরিমাণ গুরুত্ব ও সম্পদ বরাদ্দ করেছে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী ও ভৌত পরিকাঠামো (Capital Outlay) নির্মাণে। সরকার অত্যন্ত স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে। প্রতিটি খরচকে তার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক রিটার্নের নিরিখে বিচার করা হবে। এই দর্শনের ফলেই বাজেটে বেশ কয়েকটি মেগা-ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের জন্য সরাসরি ক্যাপিটাল ফান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত গভীর সমুদ্র বন্দর (Deep-Sea Port) নির্মাণ এবং কলকাতার নিকটবর্তী কল্যাণীর কাছে একটি নতুন অত্যাধুনিক গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর (Greenfield Airport) স্থাপনের জন্য জমি ও প্রাথমিক মূলধনী অর্থ মঞ্জুর করা। এ ছাড়াও, কলকাতার যানজট কমাতে চিংড়িঘাটা থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত একটি চার লেনের এলিভেটেড করিডোর এবং বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর একটি নতুন চার লেনের সেতু নির্মাণের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যাপিটাল বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা সরাসরি রাজ্যের শিল্প লজিস্টিকসকে গতিশীল করবে।

পরিকাঠামোর এই মহাপরিকল্পনা কেবল দক্ষিণবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে এই বাজেটে মূলধনী ব্যয়কে সুষমভাবে ভৌগোলিক বণ্টন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং মালদহ করিডোরে পরিকাঠামোগত সংযোগ বাড়াতে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং আসানসোলে মেট্রো রেলের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য টেকনো-ইকোনমিক সার্ভে ফান্ডের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে একটি

নতুন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT), একটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIM) এবং একটি কেন্দ্রীয় এইমস (AIIMS) স্তরের হাসপাতাল ও আঞ্চলিক ক্যানসার ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার জন্য মূলধনী বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের জিএসডিপি বৃদ্ধি করবে এবং কর রাজস্ব আদায়ের নতুন উৎস তৈরি করবে, যা ফিসকাল ডেফিসিটকে ভবিষ্যতে আরও সংকুচিত করতে সাহায্য করবে।

### দফতরভিত্তিক সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ (নিট আউটে)

১। পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতর: ৫১,৮৩৬.৫৫ কোটি

২। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর: ৪৪,৯৪৮.২১ কোটি

৩। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর: ৫২,৩০৮.৫০ কোটি

৪। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর: ৮,৫৬৫.৮৪ কোটি

গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে মজবুত করতে এই বাজেটে সর্বোচ্চ আর্থিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরে, যার মোট নিট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৫১,৮৩৬.৫৫ কোটি টাকা। এখানেও পূর্ববর্তী সরকারের একক রাজ্য-তহবিল মডেলের বদলে কেন্দ্রীয় ম্যাচিং গ্র্যান্টের মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে। যেমন, দীর্ঘদিনের বকেয়া মিটিয়ে কেন্দ্রীয় 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার' (PMAY-G) সঙ্গে রাজ্য সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হওয়ায়, রাজ্যে একযোগে ২৫ লক্ষ নতুন পাকা বাড়ি তৈরির জন্য ১৩,০০০ কোটি টাকার তহবিল নিশ্চিত করা হয়েছে। একইভাবে, ১০০ দিনের কাজের (MGNREGS) বকেয়া জট খোলার জন্য এবং কাজের দিন ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার লক্ষ্যে ১৪,০০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ 'স্টেট ম্যাচিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ম্যাট্রিক্স' গঠন করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের পকেটে সরাসরি মজুরির টাকা পৌঁছাবে, যা গ্রামীণ ভোগব্যয় (Rural Consumption) বাড়াবে এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে।

কৃষি এবং তার সঙ্গে যুক্ত সহায়ক ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রেও এই বাজেট অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং উৎপাদনশীল ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কৃষি দফতরের জন্য মোট ৮,৫৬৫.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষকদের কেবল নামমাত্র ঋণ বা অনুদান দেওয়ার পরিবর্তে, তাদের স্থায়ী পরিকাঠামোগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, পিএম-কিসান (PM-KISAN) প্রকল্পের উপর অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকার বার্ষিক নিশ্চিত রাজ্য সহায়তা সরাসরি কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, চাষের খরচ কমাতে এবং জলসেচ পরিকাঠামো উন্নত করতে সেচ পাম্পের বিদ্যুতে প্রতি ইউনিটে ২ টাকার সরাসরি বিদ্যুৎ ভরতুকি (Electricity Subsidy) ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়াও খরিফ মরশুম থেকে রাজ্যের ১৬টি প্রধান ফসলের জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' (PMFBY) চালু করতে প্রয়োজনীয় প্রিমিয়াম ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেদিনীপুরের দীর্ঘদিনের বন্যা সমস্যা স্থায়ীভাবে দূর করতে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এর জন্য এককালীন ১,২০০ কোটি টাকার ঐতিহাসিক বরাদ্দ প্রমাণ করে যে, সরকার কৃষি পরিকাঠামো রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী বিনিয়োগকে কতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং রাজ্যের মানবসম্পদ উন্নয়নে এই বাজেট অনুৎপাদক খয়রাতির লাল ফিতে কেটে সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি করার পথে হেঁটেছে। পূর্ববর্তী জমানার কম বেতনের অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রথম বাজেটেই ১ লক্ষ স্থায়ী সরকারি শূন্যপদ পূরণের সম্পূর্ণ আর্থিক রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের জন্য ৫০,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদ এবং আইন-শৃঙ্খলারক্ষার জন্য ২০,০০০ পুলিশ কর্মী পদ তৈরি করা হয়েছে, যার সাথে থাকছে মহিলাদের জন্য ৩৩% আইনি সংরক্ষণ। স্থায়ী নিয়োগের পাশাপাশি, সরকারি কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে এবং দীর্ঘদিনের ক্ষোভের অবসান ঘটাতে ১লা অক্টোবর থেকে এক ধাক্কায় ২০% মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা রাজ্যের মোট ডিএ-কে ৩৮%-এ নিয়ে যাবে। এই বাড়তি ডিএ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোনো ঋণ না নিয়ে, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক খরচ যৌক্তিকীকরণ (Expenditure Rationalization) এবং অপচয় বন্ধ করে সাশ্রয় করা হয়েছে।

শিল্পায়ন এবং বেসরকারি পুঁজি আকর্ষণের ক্ষেত্রেও এই বাজেট এক বৈপ্লবিক ভারসাম্য এনেছে। শিল্প ক্ষেত্রের জন্য সরাসরি ৩,২৬৬.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পাশাপাশি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমণ্ডল উন্নত করতে ১৯৭৬ সালের অবরুদ্ধ আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট (ULCRA) বা শহুরে জমি সিলিং আইন পুনর্বিবেচনা ও সংস্কার করার সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, দুর্গাপুরের সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট বা রোবোটিক্স ল্যাবের মতো উচ্চ-প্রযুক্তির শিল্পকে রাজ্যে টানতে একটি বিশেষ ৫,০০০ কোটি টাকার 'শিল্পোন্নয়ন মূলধন প্রণোদনা তহবিল' গঠন করা হয়েছে; যা রাজ্য জিএসটি রেয়াত এবং বিদ্যুৎ শুল্ক মকুবের মাধ্যমে বড় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে। এর পাশাপাশি ১০০ কোটি টাকার ওপর বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তর বা পুরসভার লে-আউট অনুমতির বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ রদ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি প্রমাণ করে যে, রাজ্য এখন শুধু স্বল্পমেয়াদি ত্রাণের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি ট্যাক্স-রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ভারী শিল্পের স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরিতে বদ্ধপরিকর।

পরিশেষে বলা যায়, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এই বাজেট পশ্চিমবঙ্গকে একটি নতুন অর্থনৈতিক দিশা দেখিয়েছে। এটি প্রমাণ করেছে যে, সুনির্দিষ্ট দূরদর্শিতা এবং কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঠিক সমন্বয় থাকলে একই সাথে সর্বজনীন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প চালানো এবং বড় মাপের মূলধনী পরিকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব—তাও আবার ফিসকাল ডেফিসিটকে ৩ শতাংশের আইনি সীমার মধ্যে রেখে। খয়রাতি তোষণের রাজনীতি থেকে সরে এসে উৎপাদনশীল অর্থনীতি, স্থায়ী কর্মসংস্থান, এবং কঠোর রাজকোষ শৃঙ্খলার এই সুষম ভারসাম্যই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকে একটি আধুনিক, স্বনির্ভর এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলবে।

# ছবিতে খবর

*কলকাতার রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের উপস্থিতিতে পালিত হলো ৮০তম স্বাধীনতা দিবস।*

*৬ নম্বর মুরলিধর সেন লেন কার্যালয়ে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস এবং ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সম্মানীয় রাজ্য নেতৃত্ব।*

কলকাতার গৌর পাল সরণি থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নর্থ গেট পর্যন্ত আয়োজিত গৌরবময় 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।

ভবানীপুরের পদযাত্রা থেকে রাজ্যবাসীকে 'ঘরে ঘরে তিরঙ্গা যাত্রা'র ডাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর। জাতীয় পতাকা হাতে দেশাত্মবোধের আবেগে মুখরিত ভবানীপুর।

*উত্তর কলকাতা বিজেপির ডাকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত তিরঙ্গা যাত্রায় মানুষের ঢল।*

*সিউড়িতে গৌরবময় তিরঙ্গা যাত্রায় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহ একাধিক বিধায়ক এবং অসংখ্য রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষ।*

*কোচবিহারের তুফানগঞ্জে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে মাননীয়া বিধায়ক শ্রীমতী মালতী রাভা রায়।*

*"প্রতি ঘরে তিরঙ্গা" পদযাত্রায় বিজেপি নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব।*

সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে কোর কমিটির বিশেষ বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

সল্টলেক রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে বারাসাত জেলার কোর কমিটির বিশেষ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পর্যবেক্ষক শ্রী সুনীল বানসাল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় সহ জেলা নেতৃত্ব।

কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষে কলকাতার বি.টি. রোডে কারগিল যুদ্ধের বীর শহীদ কণাদ ভট্টাচার্যের প্রতি রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে যাঁরা আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সংবর্ধনা ও পশ্চিমবঙ্গ লোকতন্ত্র সেনানী সম্মান প্রদান করেন।

# ছবিতে খবর

*দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির দেশবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং কলকাতায় সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ডাকে মহা প্রতিবাদ মিছিল।*

*অগ্নিকিশোর বীর বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে মোহবনী, পশ্চিম মেদিনীপুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধা নিবেদন।*

*স্বাধীনতা সংগ্রামী অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে সল্টলেক কার্যালয়ে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় এবং কার্যালয় সম্পাদক শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহাশয়-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন।*

পবিত্র শ্রাবণ মাসে বাবা তারকেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিয়ে তাঁর চরণে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানালেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

দক্ষিণ কোলকাতা রাসবিহারী বিধানসভার ৩নং মন্ডলে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযানে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী।

মাননীয় বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে 'প্রতি ঘরে তিরঙ্গা যাত্রা'য় মানুষের ঢল।

গঙ্গারামপুর বিধানসভার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর শহরে আয়োজিত বর্ণাঢ্য "তেরঙ্গা যাত্রা"।

ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে কোচবিহার জেলায় অনুষ্ঠিত 'হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রা'য় জেলার অসংখ্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মত।

বিজেপি জয়নগর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে জয়নগর মজিলপুরে "হর ঘর তিরঙ্গা" যাত্রায় বিজেপি কর্মী, নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ।

# বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় চেতনা

## প্রয়াণ দিবসে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

ড: কল্যাণ চক্রবর্তী

হিন্দুধর্মের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ ও কটূক্তি বিদ্যাসাগর কখনোই মেনে নেননি। যদিও বাংলার বামপন্থী চিন্তাবিদেরা বিদ্যাসাগরকে ধর্ম-উদাসীন মানবতাবাদী চরিত্র হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরকে ধার্মিক বিবেচনা করতেন বলেই তো ১৮৮২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলকাতার বাদুড় বাগানে বিদ্যাসাগরের গৃহে উপনীত হয়েছিলেন। অনুবাদক বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে আমরা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামটি জানলেও, আমরা অনেকেই জানি না, তাঁর প্রথম অনুবাদ ছিল 'বাসুদেবচরিত'।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এবং নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার বিচারে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রও সমরূপী। ২০০ বছর পেরিয়েও নিঃসঙ্গ পথিকৃৎ তিনি। অনেক বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক-শিক্ষক আছেন, কিন্তু তাঁরা কখনও 'বিদ্যাসাগর' হতে পারবেন না। বিদ্যাসাগর হতে গেলে কেবল বিদ্যার সাগর হতে হবে তাই নয়, হতে হবে দয়ার সাগর আর সততার সাগর। অজেয় পুরুষত্ব, অক্ষয় দৃঢ়তা। দুর্বুদ্ধিজীবীদের 'বিদ্যাসাগর' নামোচ্চারণ মহাপাপ বলে গণ্য হবে। এখন প্রশ্ন 'ঈশ্বরের পুত্র' কে হতে পারেন? বিদ্যাসাগর যদি ঈশ্বর-পুত্র হন, তবে কী তাপিত, দুঃখী মানুষের জন্যই তাঁর ধরাধামে আসা?

বিদ্যাসাগর ধর্ম চেতনায় নৈঃশব্দ্য ছিলেন মানেই তিনি ধর্ম-বিযুক্ত ছিলেন, তা নয়। ১৮৮২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলকাতার বাদুড় বাগানে বিদ্যাসাগরের গৃহে উপনীত হয়েছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগরকে তিনি ধার্মিক বলেই বিবেচনা করতেন। ঠাকুরের ভক্তেরা অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানেন না, তিনি নাস্তিক। শ্রীরামকৃষ্ণ মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে, কোনও মানুষ এমন জায়গায় পৌঁছতে পারেন না। অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য মহাপুরুষ।

বাংলার বামপন্থী চিন্তাবিদেরা সব সময় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে ধর্ম-উদাসীন মানবতাবাদী চরিত্র হিসেবে, তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু মূল সত্যিটা হল, পরাধীন ভারতবর্ষে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করলে, দেশের সামাজিক সংস্কারের কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে তিনি ষোলোয়ানা বাস্তববাদী ছিলেন। সেই পথে যেতে তিনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে আপস হয়তো করেছেন। আর তার জন্যই ধর্ম আধারিত সমাজ সংস্কার করতে পেরেছেন। 'ধর্ম বিযুক্ত বিদ্যাসাগর' বলে কোনও কথা হয় না।

মনে রাখতে হবে, তিনি যখন কর্মজীবন শুরু করছেন (১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর), কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে তার বছর ছয়েক আগে (১৮৩৫ সালে) মেকলে ভারতীয় সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত নড়িয়ে দিয়ে বোধন করে গেছেন ব্রিটিশ ভারতের বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনা।

**বাংলার বামপন্থী চিন্তাবিদেরা সব সময় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে ধর্ম-উদাসীন মানবতাবাদী চরিত্র হিসেবে, তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু মূল সত্যিটা হল, পরাধীন ভারতবর্ষে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করলে, দেশের সামাজিক সংস্কারের কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে তিনি ষোলোয়ানা বাস্তববাদী ছিলেন।**

মেকলের নীতি অনুসরণ করে ভারতে ব্রিটিশরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী পাঠ যথাসম্ভব পাঠ্যসূচিতে রাখবে না, হিন্দু ধর্মের গরিমা-প্রকাশক কোনও পাঠ তো নয়ই। চাকরি জীবনের প্রথমে এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরকে আমরা বিশেষভাবে প্রকাশ হতে দেখি। কেউ কখনও অস্বীকার করতে পারবেন না, বিদ্যাসাগরের আনা নবজাগরণ হিন্দু-নবজাগরণ নয়। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, নিজের আরব্ধ কাজ করার জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর বহু রচনাই হিন্দু ধর্ম আধারিত।

অনুবাদক বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে আমরা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) নামটি জানলেও, আমরা অনেকেই জানি না, তাঁর প্রথম অনুবাদ ছিল 'বাসুদেবচরিত'। নমুনা যা পাওয়া গেছে, অসাধারণ সুললিত ছিল এই গ্রন্থ, অনুবাদ-কর্মের প্রথম পরীক্ষা, লিপিচাতুর্য আর ভাষা-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এর পাণ্ডুলিপিটি রচিত হয় সম্ভবত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরিরত অবস্থায় (১৮৪২ – ১৮৪৬ এর মধ্যে)। বিদ্যাসাগর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার অনুমান করেছিলেন, এ আখ্যানে হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের কাহিনী গৃহীত হয়েছিল বলে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ এটি কলেজের পাঠ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সম্মত হননি।

বাংলা সাহিত্যের তন্নিষ্ট গবেষক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, 'বাসুদেবচরিত' বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে আর এই পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর নিজে তা পরে প্রকাশ করতে চেয়ে খুঁজে পাননি। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বইটি কীটদষ্ট অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং জীবনীকারদের দেখিয়েও ছিলেন। অর্থাৎ জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, এই বোধে নিজেকে পরবর্তী সময়ে পরিচালিত করে থাকবেন। তারই অনুভবে

*ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ি।*

নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে থাকবেন। হিন্দু ধর্মের প্রচার করতে গিয়ে সাহেবদের চটালে, তাঁর সমাজসংস্কারের কাজ পাছে বাধা পায়, সেজন্য অন্যভাবে হিন্দু ধর্মের সামীপ্যে সান্নিধ্যে বিরাজ করলেন।

তখন প্রগতিশীলতা মানেই ছিল ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়া। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে ব্রাহ্ম হতে দেখিনি আমরা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম মনীষীর সঙ্গে তাঁর চির ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুই থেকে গেছেন। বরং প্রিয়পাত্র শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হয়ে গেলে, তা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত, ব্যথিত করেছিল।

বিদ্যাসাগরের লেখা চিঠিপত্রের শীর্ষে অবশ্যই স্থান পেত 'শ্রীহরি শরণম্'। এটা দেখবার মত ব্যাপার। শুধুই কী আচার পালন!

হিন্দুধর্মের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ ও কটূক্তি তিনি কখনোই মেনে নেননি। একসময় সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারক একটি মামলার রায়দানের সময় প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কটূ কথা বলেছিলেন, অশালীন কথা বলেছিলেন। তার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর, গর্জে উঠেছিলেন তিনি। কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দিলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ হাজার গণ্যমাণ্য মানুষের সাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি পাঠালেন ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েটে। চিঠির গুরুত্ব অনুভব করে ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েট ভারত সরকারকে নির্দেশ দিল, সুপ্রিম কোর্টের সেই বিচারককে সতর্ক করে দিতে হবে। জয় হল বিদ্যাসাগরের, জয় হল হিন্দুর।

হিন্দুধর্মে যে দশটি মানবিক গুণ থাকলে যিনি যথার্থ ধার্মিক হতে পারেন, তার সমস্ত গুণই বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই – ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। যদি তাই হয়, তবে তিনি অবশ্যই হিন্দু-ধার্মিক।

বিদ্যাসাগর গীতার উপদেশ অনুসারে চলবার কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর স্নেহধন্য ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্য চরণ বসু (১৮৬২–১৮৯৮; ১৮৮৬ সালে কলকাতা মেডিক্যাল স্কুল থেকে এম.বি উত্তীর্ণ) একবার বিদ্যাসাগরের ধর্মবোধ ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "গীতার উপদেশ অনুসারে চললেই ভালো হয়।"

কোনো এক ভয়াবহ লঞ্চডুবিতে প্রায় ৮০০ জন আরোহীর মৃত্যু হলে, তিনি সখেদে বলে উঠেছিলেন, "এই কাজ কি দুনিয়ার মালিকের?"

নানান সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও তার সুলুকসন্ধান করেছিলেন, গভীরে গিয়েই পাঠ করেছিলেন শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্য। কিন্তু তবুও তিনি নিরীশ্বরবাদী। বলা হয়ে থাকে বুদ্ধের পর বিদ্যাসাগরই প্রথম ভারতীয় মনীষা যিনি ঈশ্বর নিয়ে চিন্তা করেন নি। গৌতমবুদ্ধ যেখানে হিন্দুদের দশাবতারের একজন হয়ে উঠলেন তবে কেনই বা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র' হয়ে উঠবেন না? যিনি কর্মফলের আশা না করে নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন এবং অক্ষয় মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন; গীতার উপর আস্থা রেখেছিলেন, তিনি তো কর্মযোগী হিন্দু সন্ন্যাসীই হবেন! তাই নয় কী?

বিদ্যাসাগরের জীবনে আরও একটি ঘটনা থেকে মনে হয়, তিনি ব্রাহ্ম কিংবা খ্রিস্টান মহিলাদের তুলনায় হিন্দু মহিলাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে স্ত্রী শিক্ষাবিদ মেরি কার্পেন্টার ভারতে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বেথুন

**তিনি ব্রাহ্ম কিংবা খ্রিস্টান মহিলাদের তুলনায় হিন্দু মহিলাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে স্ত্রী শিক্ষাবিদ মেরি কার্পেন্টার ভারতে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বেথুন স্কুলে একটি শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলেন। কারণ এতদিন বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষেরা পড়াতেন।**

*১৮৮২ সালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব-এর।*

স্কুলে একটি শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলেন। কারণ এতদিন বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষেরা পড়াতেন।

বিদ্যাসাগর প্রথমে কার্পেন্টারকে সঙ্গ দিলেও পরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিলেন। যুক্তি ছিল সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত বয়স্কা মেয়ে পাওয়া যাবে না। বিপুল সামাজিক বাঁধা আসবে তাদের প্রতি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এটা তো হিন্দু ঘরের মেয়েদের জন্য সত্য। শিক্ষিকা হিসাবে তো ব্রাহ্ম মহিলারাও আসতে পারতেন; খ্রিস্টান মহিলারাও আসতে পারতেন, তাদের জন্য তো সত্য নয়। তারা তো অনেকেই শিক্ষিতও ছিলেন, সামাজিক বাঁধাও পেতেন না সেভাবে।

তাহলে কি বিদ্যাসাগর মনে করেছিলেন, শিক্ষিকা হিসাবে হিন্দু মেয়েরা সুযোগ না পেলে, শিক্ষা জগতে ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান শিক্ষিকারা দাপিয়ে বেড়াবে? ধর্মীয় প্রভাব ফেলবে? একজন হিন্দু পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া আর একজন হিন্দু নারীকে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। শিক্ষিকা হিসাবে হিন্দু নারীর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরূপ চিন্তন তৈরি করে দিলে তা হিন্দু সমাজে দীর্ঘকালীন ক্ষতি করে দিতে পারে, এটা পরিস্কারভাবে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তাই সেই ফাঁদে পা দেন নি।

বিদ্যাসাগর যুক্তি দেখালেন, বিধবা বিবাহে বিধবা মেয়ে ঘর পাচ্ছে, কিন্তু নতুন বিদ্যালয়ে ঘরের মেয়ে বাইরে আসার সূচনা হবে। এটা কয়েক বছরের শিক্ষা লাভের বিষয় নয়। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন তা সমাজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ এখানে যদি হিন্দু সম্পন্ন ঘরের কোনো মেয়ে আসে, তার বিধবা হবার সম্ভাবনাই বেশি।

*মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটা।*

বিদ্যাসাগরের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, বিধবা বিবাহের ফলশ্রুতিতে বিধবা আপন ঘর পাক।

তাঁর নিজের উক্তি "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার-জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা কোন সৎকর্ম করিতে পারিবো, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।" সৎকর্ম করা হিন্দু ধর্মের এক পবিত্র কাজ। বিদ্যাসাগর শুধু সমাজ সংস্কারক নয়, তিনি হিন্দু ধর্মের অভিমত ও প্রথা মেনে চলার পন্থী এক সংস্কারক।

বিদ্যাসাগরের ধর্মে মতি না থাকার পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক নিবৃত্তি হয়তো কাজ করে থাকবে। গরিব ঘরের ছেলেটি জানতেন যে, তাঁর ঠাকুরদা (পন্ডিত রামজয় তর্কভূষণ) সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়েছেন; ঠাকুমা (দুর্গাদেবী) প্রবল দুরবস্থায় পড়েছেন তাঁর ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে; সুতো কেটে বাজারে বিক্রি করে যে মহিলাকে সংসার চালাতে হয়; যার ১৫ বছরের ছেলেকে কাজ জোটাতে গিয়ে কলকাতার পথে পথে চলতে গিয়ে ক্ষুধায় মূর্ছা যেতে হয়, সেই পরিবারের একজন সংবেদনশীল অতল জ্ঞানী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অথচ মানব দরদীর ধর্মে বিশেষ মতি থাকলে, "ঘর পোড়া গরুর সিঁদূরে মেঘ দেখে ডরানো"-র মতো অবস্থা হয় পরিবারের।

তিনি নিজেও সদাসর্বদা খেয়াল রাখেন, অধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম দর্শন যেন তাকে অন্তত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী না করে তোলে। আর বিদ্যাসাগর তো সন্ন্যাসীই ছিলেন; মননে, কর্মে বাস্তববোধে। প্রাচীন ঋষিদের মতো যার প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য, মানুষের জন্য যার অপরিমিত দয়া বাঙালি রমণীর মতো কোমল করে তোলে, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী না হয়ে যান না। তিনি পুণ্যশ্লোক, তিনি পবিত্র ঋষি।

# পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস

**দীপল বিশ্বাস**

**পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদের সফলতা কতটা গুরুত্বপুর্ন তা পূর্ব সিন্ধু তৈরিতে কংগ্রেসের সিন্ধি নেতা জেবি কৃপালিনীর ব্যর্থতার তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়।**

২০২৬-এর নতুন পশ্চিমবঙ্গে দেখছি। যারা এতদিন মানতেই চায়নি পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য আছে, তারাই আজ যখন দেখল সারা রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন হচ্ছে এবং মানুষের কাছে সেই ইতিহাস চেপে রাখা যাচ্ছে না, তখন ইতিহাস বিকৃতকারী কংগ্রেস-বামপন্থী শক্তি নতুন বিভ্রান্তিকর কথা শুরু করেছে। কেন এতদিন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস চেপে গেছিল সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলছে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ৫৮ ভোটের মধ্যে ৫৪ ভোট কংগ্রেসের আর ১ ভোট শ্যামপ্রসাদ মুখার্জির। তাহলে কি করে ও কীভাবে উনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা হন। তার অবদান তো মোটে এক ভোট আসল কৃতিত্ব কংগ্রেসের। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আর কংগ্রেসের নীতিহীন সিদ্ধান্তহীনতার জবাব দিতেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

কংগ্রেস সবসময় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মেকি নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে হিন্দুদের ন্যায্য দাবির প্রশ্নেও নীরবতা পালন করেছে। যেন 'নিরপেক্ষতা' মানে ন্যায়-অন্যায়ের ক্ষেত্রেও কোনো পক্ষ নেওয়া যাবে না। আর সেই কারণেই বাংলা ও পাঞ্জাবের মত একই প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও কেন সিন্ধু প্রদেশ ভাগ হল না? সর্বভারতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে দেশভাগের সময় হিন্দু স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসের হাইকমান্ডের নীতি ঠিক কি ছিল?

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও বঙ্গ বিভাগের বিস্তারিত বা ধারাবাহিক প্রয়োজনীয় তথ্য পড়ার সুযোগ পায়নি এরাজ্যের দেশভাগ পরবর্তী প্রজন্ম। অনেক ক্ষেত্রেই অন্যদের কথা বা কিছু রিপোর্টিং থেকে অনেকে এই বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকেন, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে সার্বিক নয়, ত্রুটিপূর্ণ, পরস্পর-বিরোধী। তাই অনেকের মনে বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে যার উত্তর ঠিকমতো না পেয়ে ভুল ধারণা তৈরি হয়। অনেক সময় ভুল তথ্য কেউ দিলেও তার প্রত্যুত্তরে পালটা সঠিক তথ্য অন্যরা দিতে পারেন না। এই নিবন্ধে গভীর কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

**(১) পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, '১৫ আগস্ট ১৯৪৭'-এ পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আমরা ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস কেন বলব?**

এটার কারণ খুব পরিষ্কার যে, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশ ভেঙে নতুন রাজ্য হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর যাত্রা শুরু হলেও এর সিদ্ধান্ত হয়েছিল ওই বছরের ২০ জুন বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভায় আনা তিনটি প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে।

**(২) ১৯৪৭ সালে বঙ্গের আইনসভা কীরকম ছিল? কোন দলের ক'টি আসন ছিল? তিনটি প্রস্তাব কীভাবে ভোটাভুটি হয়েছিল?**

১৯৪৭ সালের অবিভক্ত বঙ্গে প্রাদেশিক বিধানসভায় মোট আসন ২৫০-এর মধ্যে মুসলিম লিগ ১১৪, কংগ্রেস ৮৬, হিন্দু মহাসভা ১, সিপিআই ৩, অন্যান্য হিন্দু ১৩, অন্যান্য মুসলিম ৮ এবং ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা বঙ্গবিভাগ করার প্রস্তাবে তিনটি পৃথক ভোট দেন:

বঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত হাউসের যৌথ অধিবেশনের ভোট বিভাজন (ডিভিশন) ছিল- ১২৬টি ভোট বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে এবং ৯০টি ভোট বঙ্গ বিভাগ করার এবং বিদ্যমান গণপরিষদে (ভারতে) যোগদানের পক্ষে। অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গ বিধানসভা পাকিস্তানের যোগদানের প্রস্তাব পাশ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব হিন্দু সদস্য ভারতের পক্ষে ভোট দিলেও তিন কমিউনিস্ট সদস্য প্রথম ভোটদানে বিরত থাকে। এরপর দু'টি বিভক্ত বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ হয়।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যরা একটি পৃথক অধিবেশনে ১০৬-৩৫ দ্বারা বঙ্গ বিভাগ করার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাশ করে এবং একটি নতুন গণপরিষদে (পাকিস্তানে) যোগদান করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিম দিকের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যদের একটি পৃথক অধিবেশনে ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এখানে দু'টি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে কিছু কুচক্রী।

**(৩) বিধানসভায় মুসলমান সদস্যরা বঙ্গ বিভাগ করেনি, হিন্দু সদস্যরা বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছে, তাহলে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে বঙ্গ বিভাগের জন্য দায়ী কে?**

১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটির বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে সেটা মনে হতে পারে। কিন্তু যদি ভালোভাবে তিনটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, সংযুক্ত সভায় প্রথম প্রস্তাবটি ছিল অবিভক্ত বঙ্গ কোন দিকে যাবে, ভারতে নাকি পাকিস্তানে? সেই প্রস্তাবে বঙ্গীয় আইনসভার মুসলমান সদস্যরা পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেয়, ফলত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পুরো বঙ্গ পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে প্রস্তাব পাশ হয়। অর্থাৎ ভারত ভেঙে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে দেশভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান গঠনের পক্ষে প্রথম ভোট দেয় মুসলমান সদস্যরা প্রথম প্রস্তাবে। এর উল্টোটা অর্থাৎ প্রথম প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশ ভারতে থাকার পক্ষে পাশ হলে পরের দু'টো প্রস্তাবের ভোটাভুটির ফল উলটে যেত, অর্থাৎ হিন্দু সদস্যরা সম্পূর্ণ বঙ্গ ভারতে থাকার পক্ষে ভোট দিত আর মুসলমান সদস্যরা বঙ্গ বিভাগ করে পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিত।

**(৪) ২০ জুন ১৯৪৭ বঙ্গ বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রস্তাবের পক্ষে যে ৫৮ জন সদস্য ভোট দেন তার মধ্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু মহাসভার মাত্র ২ জন সদস্য ছিলেন। অপরদিকে বেশিরভাগটাই কংগ্রেসের সদস্যরা ছিলেন। তাহলে কমিউনিস্টরা কীভাবে অপপ্রচার চালায় যে, বঙ্গ বিভাগ করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়?**

এই প্রশ্নটির উত্তর একটু বিশদে না দিলে পরিষ্কার হবে না যে, 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির কৃতিত্ব একমাত্র ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি নিজেও বলেছিলেন-'Jinnah divide India,

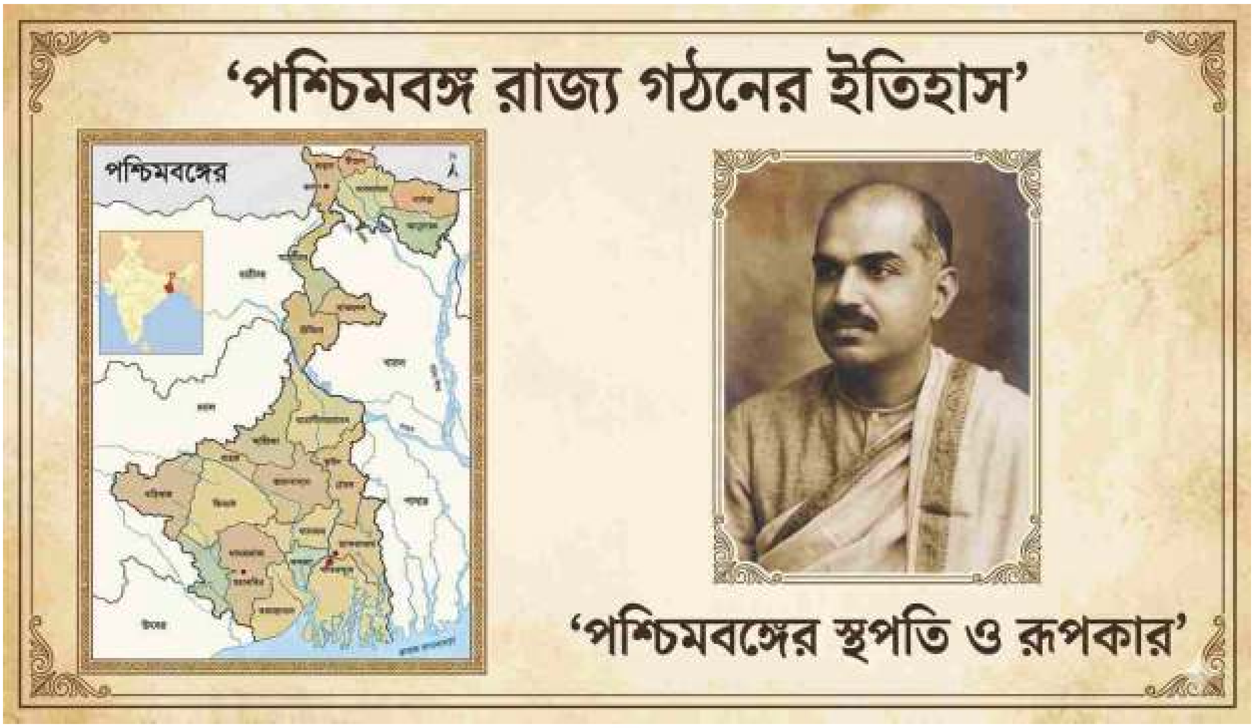

I divided Pakistan.' ১৯৪৭-এ বঙ্গ, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এবং সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের বিস্তারিত চর্চা হলেই এটা পরিষ্কার হবে। সকলের সত্যের উপলব্ধি হবে।

১৯৪৭ সালে সিন্ধু প্রদেশের জনবিন্যাস প্রায় বঙ্গের মতোই ছিল, সেখানে বিধানসভায় মোট ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে কংগ্রেসের ১৮ জন আর মুসলিম লিগের ২৮ জন ছিল।

তাহলে সেইসব হিন্দুগরিষ্ঠ অংশের বিধায়ক-রা মিলে ভোট দিয়ে একটা 'পূর্ব সিন্ধু' ভারতে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বঙ্গ ও পঞ্জাবের মতো কোনো ভোটই ১৯৪৭-এ সিন্ধু বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হলো না কেন? ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বলেই তো ৫৮ জন বিধায়ক ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করেছিলেন এবং এখানেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান। আজ পাকিস্তানের শাসনাধীন সিন্ধু প্রদেশের কী অবস্থা হয়েছে? ১৯৪৭-এর পরেই সেখানে জনবিন্যাস পুরো পালটে গেল আর উদ্বাস্তু হিন্দু সিন্ধিরা রাজ্যহীন হয়ে ভারতে এসে বিভিন্ন রাজ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়লেন। এটা যে বঙ্গের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে হবে সেটা তখনই বঙ্গের হিন্দুদের সতর্ক করে বোঝাতে পেরেছিলেন দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ। এখানেই তাঁর অবদান।

ও বেঁচে থাকার ঠাঁই পেয়েছে হিন্দু বাঙ্গালি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান না বুঝে তাঁকে অসম্মান, অবজ্ঞা করা হলো কমিউনিস্টদের অকৃতজ্ঞতা। সংখ্যা দিয়ে সব হয় না যদি সেই জাতির স্বাভিমানবোধ ও দূরদর্শিতা না থাকে।

বঙ্গের মতোই ১৯৪৭-এ সিন্ধু প্রদেশেও অধিকাংশ হিন্দু এমএলএ কংগ্রেসের ছিলেন, শুধু তাই নয়, তখন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন জেবি কৃপালনী, যিনি ১৯৪৬-৪৭ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান জহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন সিন্ধি, তাও কেউ 'পূর্বসিন্ধু'র দাবি তোলেননি। তার ফল ভুগতে হলো পরবর্তী প্রজন্মের হিন্দু-সিন্ধিদের। তাঁরা অনেকেই আর্থিকভাবে প্রভাবশালী হলেও ১৯৪৭-এর পর তাঁদের কোনো নিজস্ব রাজ্য নেই। পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী হিন্দু প্রজন্ম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান না বোঝার কারণ হলো ভারতের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে নেই। এই ইতিহাসকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। যাতে কোনোভাবে কংগ্রেসকে সমালোচনায় না পড়তে হয়।

বঙ্গ, পঞ্জাব ও সিন্ধুর বেশিরভাগ হিন্দু এমএলএ কংগ্রেসের ছিলেন, কিন্তু হিন্দু হোমল্যান্ডের জন্য বঙ্গ বিভাগের দাবি প্রথম তুলেছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একমাত্র হিন্দু মহাসভা। তারই অনুসরণে শিখ ও হিন্দুদের জন্য পঞ্জাব ভাগের দাবি তুলেছিলেন অকালি নেতা মাস্টার তারা সিংহ, কিন্তু সিন্ধুতে কংগ্রেস ছাড়া হিন্দুদের আর কোনো দল ও প্রতিনিধি বিধানসভায় ছিল না, তাই সিন্ধু ভাগের দাবি উঠল না। কংগ্রেসের ১৮ জন এমএলএ-র কেউ সিন্ধু ভাগের দাবি তুললেন না, যদিও তখন ভারতের রাজস্থান সংলগ্ন পূর্ব সিন্ধু হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

| প্রাদেশিক আইনসভা, ১৯৪৬ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রদেশ | কংগ্রেস | মুসলিম লিগ | অন্যান্য রাজনৈতিক দল | নির্দল | মোট |
| বঙ্গ প্রদেশ | ৮৬ | ১১৩ | ইউরোপীয় সদস্য-২৫<br>অন্যান্য-১২ | ১৪ | ২৫০ |
| পঞ্জাব | ৫১ | ৭৩ | অকালি-২২<br>ইউনিয়নিস্ট পার্টি-২০<br>মজলিস-এ আহরার-এ<br>-ইসলাম-২ | ৭ | ১৭৫ |
| সিন্ধু প্রদেশ | ১৮ | ২৮ | ১০ | ৪ | ৬০ |

তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর সমর্থনে তারকেশ্বরে প্রথম সভা করেন। তারপর দলমত নির্বিশেষে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরাও পশ্চিমবঙ্গের সমর্থনে দিকে দিকে সভা সমিতি করতে শুরু করে। সেইজন্যই সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালিরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। তারা কংগ্রেসের এমএলএ-দের (আইনসভার সদস্যদের) চিঠি দিয়েছিল, কারণ বিধানসভায় কংগ্রেসের এমএলএ তখন বেশি ছিল। কংগ্রেসের নিজস্ব দাবি যদি এটা থাকবে তাহলে সাধারণ মানুষকে এমএলএ-দের চিঠি দিতে হবে কেন যে তোমরা দলের নীতি উপেক্ষা করে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দাও। এইজন্যই সভা-সমিতি, জনমতের চাপ যাতে কংগ্রেসের এমএলএ-দের উপর পড়ে সেই লক্ষ্যে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। আজ পাকিস্তানের বাসিন্দা হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের পরিবর্তে ভারতের মধ্যে মাথা গোঁজার

এখানেই তুলনা আসে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি সিন্ধি নেতা জেবি কৃপালনীর। কংগ্রেসের ১৮ জন সিন্ধি এমএলএ হয়তো জেবি কৃপালনীর ভরসাতেই ছিলেন। ভরসাটা এই ছিল যে, তিনি যখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি, তিনি যেহেতু সিন্ধের মানুষ, সুতরাং হিন্দু সিন্ধিদের স্বার্থ তিনি

অবশ্যই রক্ষা করবেন। কী হলো তার ফল তা আজ জানে গোটা দেশ। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এর পরে যখন জেবি কৃপালনী বুঝতে পারলেন যে ভুল হয়ে গেছে তখন তিনি দেশ বিভাগে নিজের অসন্তুষ্টি জানিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন, কিন্তু তখন পদত্যাগ করে কী লাভ হলো? হিন্দু সিন্ধিরা বরাবরের মতো রাজ্যহীন হলেন। গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে যারা তার মুখাপেক্ষী ছিলেন তাদের এরকম সর্বনাশ কোনো ভুল নয়, অপরাধ বলা যায়।

আর কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি যদি অদূরদর্শী হন, তিনি যদি নিজের রাজ্যের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় দাবি তুলতে না পারেন, তবে সেই রাজ্যের হিন্দুদের আর কী পরিণতি হতে পারে? বঙ্গ ও পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও যদি হিন্দু মহাসভা বা অকালি দল প্রথমে দাবি তুলে জনমত তৈরি না করত, তবে কংগ্রেস বঙ্গভূমির হিন্দুপ্রধান অংশকে ভারতের মধ্যে ধরে রাখার দাবি নিজের থেকে তুলত না সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই স্পষ্টত বলাই যায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে সেদিন 'পশ্চিমবঙ্গ' তৈরি হতো না।

কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু ও কৃষক প্রজা পার্টির (পরবর্তীতে মুসলিম লিগের) নেতা ফজলুল হক যে 'হিন্দু-মুসলিম' সংযুক্ত বঙ্গের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেটা কি ঠিক হয়েছিল? এটাও সহজেই বোঝা যাবে সংযুক্ত সিন্ধ প্রদেশের কথা চিন্তা করলে। হিন্দু সিন্ধিরা তো আলাদা সিন্ধু ভাগের কথা বলেনি। তারা মুসলমানদের সঙ্গে সংযুক্ত সিন্ধেই থাকতে চেয়েছিল। সেই সংযুক্ত সিন্ধের পরিস্থিতি ১৯৪৭-এর পর কী হলো সেটা পর্যালোচনা করলেই 'যুক্ত বঙ্গ'-এর পরিস্থিতি কী হতো তা সহজেই বোঝা যাবে। সিন্ধ ভাগের দাবি না ওঠার অন্যতম একটা কারণ পঞ্জাব ও বঙ্গের তুলনায় সিন্ধের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তুলনামূলক অনেক শান্ত ছিল। ১৯৪৭-এর আগে সেখানো বড়ো কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু ১৯৪৭-এর পরেই পরিস্থিতি পুরো পালটে গেল। ১৯৪৮-এর ৬ জানুয়ারি করাচি শহরে একই দিনে জেহাদিদের হাতে ৮০০ জন শিখ হত্যা হলো। নিরাপত্তার অভাবে হিন্দু সিন্ধিরা অবিভক্ত সিন্ধু ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হলেন। যার ফলে সিন্ধ প্রদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ থেকে আজ কমে দাঁড়িয়েছে ৯ শতাংশে, যারা এখনও বাধ্য হয়ে সেদেশে টিকে রয়েছে, অমানবিক পরিস্থিতি সহ্য করে বেঁচে রয়েছে। ১৯৫১ সালের জনসংখ্যা অনুসারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। আজ সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশের নীচে। পরিসংখ্যান কথা বলে। মুসলিম লিগ প্রস্তাবিত 'যুক্তবঙ্গ'-এ হিন্দুদের পরিস্থিতি যে সিন্ধুর মতোই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেটা বুঝেছিলেন দূরদ্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মানুষকেও বুঝিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার জন্য বাঙ্গালি হিন্দু রাজ্যহীন উদ্বাস্তু হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

**(৫) সিন্ধু ভাগ না চেয়ে অবিভক্ত সিন্ধ প্রদেশ হওয়ায় হিন্দু সিন্ধিরা যে প্রতারিত হলেন, সেই ভুল সংশোধনের কোনো চেষ্টা হয়নি কেন? তাদের মাতৃভূমির অধিকার আদায়ের কী উপায় আছে?**

না, কোনোরকম চেষ্টা হয়নি। ভুল বুঝতে পারলে তবে তো সংশোধনের প্রশ্ন! সেই লক্ষ্যে কেন কোনো চেষ্টা হয়নি তার কারণ- স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে জওহরলাল নেহরু নেতৃত্বাধীন ভারতের শাসক দল কংগ্রেসের নীতি বা বলা ভালো নীতিহীনতা। কংগ্রেস সবসময় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মেকি নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে হিন্দুদের ন্যায্য দাবির প্রশ্নেও নীরবতা পালন করেছে। যেন 'নিরপেক্ষতা' মানে ন্যায়-অন্যায়ের ক্ষেত্রেও কোনো পক্ষ নেওয়া যাবে না। মুসলমানদের অন্যায়ের বিপক্ষে তো যাওয়াই যাবে না। এর ফলে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে দেশজুড়ে হিন্দু প্রতিনিধি সব কংগ্রেসের হলেও তারা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়েও সেই ট্র্যাডিশন চলতে থাকে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হয়ে দাঁড়ায় মুসলমান তোষণের নামান্তর।

দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত এই নীতি কংগ্রেসের বাইরেও শিক্ষিত, সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করে-যেন অহিংসা মানে সংখ্যাগুরুর ন্যায্য দাবির পক্ষে কোনো কথা বলা যাবে না। পরে এটাই বামপন্থা, এলিটিজম্ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তান স্থিতাবস্থা ভেঙে মুসলমানদের অধিকারের নামে কাশ্মীরের একাংশ দখল করলেও, সিন্ধি হিন্দুদের অধিকার আদায়ে ভারতীয় নেতৃত্ব সিন্ধের দাবিটুকুও করেনি। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে যুদ্ধে জড়িয়েছে ভারত, পাকিস্তানের মানচিত্র পালটিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে রয়ে যাওয়া হিন্দুদের অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে কিছু করেনি, স্বচ্ছ নীতির অভাবে। ইহুদিরা যদি প্রায় ২০০০ বছর আগে বিতাড়িত হয়েও ১৯৪৮ সালে আবার তাদের দেশ ফিরে পেতে পারে, আর তাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমর্থন থাকে, তাহলে এখনও দেশভাগের সময় প্রতারিত সিন্ধি হিন্দুদের জন্য 'পূর্ব সিন্ধু'র দাবি হলো তাঁদের ৩০ শতাংশ পূর্বপুরুষের মাতৃভূমির অধিকার।

একই ভাবে ১৯৫১ পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমাগত দেশত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া ২২ শতাংশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হিন্দুর উত্তরাধিকারীদের অধিকার রয়েছে তাঁদের মাতৃভূমির উপর আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই। কারণ এই একমুখী জনস্রোতের কারণ হিসেবে ১৯৪৭-এর দেশভাগকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু মুসলমানদের কোনো স্রোত কিন্তু নেই, সেটা দুই দেশের জনসংখ্যা রিপোর্টেই স্পষ্ট। কিন্তু যেকোনো ন্যায্য অধিকরণ শক্তি প্রয়োগ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভারত দীর্ঘদিনের দুর্বল বিদেশনীতি কাটিয়ে বলিষ্ঠ বিদেশনীতির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। তাই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের পাশাপাশি আগামীতে এই দিকগুলোতেও ভারত সরকারের নতুন চিন্তাভাবনার প্রত্যাশা জনমানসে ঘনীভূত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এর সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে।

# বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে নতুন ভারতের উত্থান

## গ্লাসগোর গৌরব, আহমেদাবাদের স্বপ্ন

**অভিরূপ ঘোষ**

**আজ ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো সাধারণ পরিবারের সন্তানও বিশ্বাস করতে শিখেছে যে বিশ্বমঞ্চে দেশের হয়ে পদক জয় করা অসম্ভব নয়। এই আত্মবিশ্বাসই নতুন ভারতের সবচেয়ে বড় অর্জন। সামনে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস। আয়োজক ভারত, শহর আহমেদাবাদ। গ্লাসগো আমাদের গর্বের গল্প লিখেছে। আহমেদাবাদ সেই গল্পকে আরও মহিমান্বিত করার অপেক্ষায়।**

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর আকাশে যখন একের পর এক মঞ্চে ভারতের তিরঙ্গা উড়ছিল, আর পটভূমিতে বাজছিল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, তখন সেটি শুধু কয়েকটি পদকের উল্লাস ছিল না; ছিল এক দীর্ঘ সাধনা, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন ভারতের ক্রীড়া-চেতনার প্রতিফলন।

২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারত ১৩টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য ও ৯টি ব্রোঞ্জ—মোট ৩৯টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। প্রথম দর্শনে কারও মনে হতে পারে, ২০২২ সালের বার্মিংহামের ৬১টি পদকের তুলনায় এবার ভারতের সাফল্য কম। কিন্তু প্রকৃত চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আসলে ২০২৬ সালের গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ছিল ইতিহাসের অন্যতম ব্যতিক্রমী আসর। আর্থিক ও সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে মাত্র ১০টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২০২২ সালের বার্মিংহামে ছিল ১৯টি খেলা। অর্থাৎ, প্রায় অর্ধেক খেলাই এবারের সূচি থেকে বাদ পড়ে। ফলে বহু দেশের মতো ভারতও তার ঐতিহ্যগত পদক জয়ের বড় সুযোগ হারায়।

ভারতের জন্য এই প্রভাব ছিল আরও বেশি। ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, টেবিল টেনিস, হকি, ক্রিকেট, স্কোয়াশ, রাগবি সেভেন্স, ট্রায়াথলন ও বিচ ভলিবলের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি অনুষ্ঠিতই হয়নি। এই খেলাগুলিতেই ২০২২ সালে ভারত প্রায় ৩০টি পদক জিতেছিল। তাই শুধু মোট পদকের সংখ্যা দেখে দুই আসরের তুলনা করা বাস্তবসম্মত নয়। বরং সীমিত সংখ্যক খেলায় অংশ নিয়েও ভারত যে চতুর্থ স্থান ধরে রেখেছে, সেটিই ভারতের প্রকৃত সাফল্যের পরিচয় বহন করে।

পরিসংখ্যানের বাইরেও এবারের গেমস ভারতের জন্য আরও বড় বার্তা দিয়েছে। একসময় ভারত কয়েকটি নির্দিষ্ট খেলার উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এখন সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমেছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চিরাচরিত ধারার বাইরে বহু খেলায় গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। ফলে নতুন নতুন খেলায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা আন্তর্জাতিক মানের সাফল্য অর্জন করছেন। এই পরিবর্তনই ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে ইতিবাচক সংকেত।

বিশেষ করে বক্সিংয়ে ভারতের আধিপত্য ছিল উল্লেখযোগ্য। সাতটি স্বর্ণসহ মোট ১০টি পদক জিতে ভারত নতুন ইতিহাস গড়েছে।

জুডোতেও এসেছে সর্বকালের সেরা সাফল্য। ভারোত্তোলন, অ্যাথলেটিক্স এবং প্যারা অ্যাথলেটিক্সেও ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অসাধারণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। যে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত পদক জয়ের দৌড়ে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই সাফল্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, প্রতিভা অন্বেষণ, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। গত এক দশকে ভারতীয় ক্রীড়ার ভাবনায় মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। একসময় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই ছিল বড় লক্ষ্য; এখন লক্ষ্য বিশ্বসেরা হওয়া।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময়ে খেলো ইন্ডিয়া, টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (TOPS), ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক স্পোর্টস সায়েন্স, বিদেশি কোচ নিয়োগ, খেলোয়াড়দের পুষ্টি, মানসিক প্রশিক্ষণ এবং উন্নত সরঞ্জামের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে এনে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ভারতের ক্রীড়া সাফল্য এখন আর কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভার উপর নির্ভরশীল নয়; এটি একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থার ফল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন সময়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আগে শুভেচ্ছা ও উৎসাহ প্রদান এবং ক্রীড়াকে জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর সরকারের সময়ে খেলাধুলাকে শুধু বিনোদন নয়, জাতি গঠনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীণ স্তরে প্রতিভা অন্বেষণ এবং খেলোয়াড়দের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সাফল্যের ভিত আরও মজবুত করেছে।

আজ ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো সাধারণ পরিবারের সন্তানও বিশ্বাস করতে শিখেছে যে বিশ্বমঞ্চে দেশের হয়ে পদক জয় করা অসম্ভব নয়। এই আত্মবিশ্বাসই নতুন ভারতের সবচেয়ে বড় অর্জন।

ভারতের সাম্প্রতিক ক্রীড়া সাফল্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। টোকিও অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, প্যারা এশিয়ান গেমস, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এখন কমনওয়েলথ গেমস—প্রতিটি বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পদক সংখ্যা এবং বিভিন্ন খেলায় প্রতিনিধিত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, ভারত আর এক-দুটি খেলায় সীমাবদ্ধ নেই; বহু ডিসিপ্লিনে সমান দক্ষতা অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে।

তবে এই সাফল্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য রয়েছে এক বড় আক্ষেপ। ভারতের মোট ১৭টি রাজ্যে কোনো না কোনো পদক পৌঁছালেও খেলাধুলার একসময়ের স্বর্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ঝুলিতে একটি পদকও আসেনি।

রাজ্যে বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। তারা প্রায় তিন মাস আগে ক্ষমতায় এসেছে। এত অল্প সময়ে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়া স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়। বর্তমান রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছে বটে, তবে তার ফল পেতে নিশ্চিতভাবেই কয়েক বছর সময় লাগবে।

আসলে বিগত ৫০ বছরে প্রথমে বামফ্রন্ট এবং পরে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়াক্ষেত্রে এতটাই পিছিয়ে পড়েছে যে তাকে আবার এগিয়ে আনতে ইন্দ্রনীল খাঁ ও শুভেন্দু অধিকারীদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তবে তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না।

বাঙালির আবেগের অন্যতম প্রতীক মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ। একসময় এই ম্যাচের টিকিট পেতে সারারাত খোলা আকাশের নিচে অপেক্ষা করতে হতো এবং পরদিন সকালে কাউন্টার খোলার অপেক্ষায় থাকতে হতো। পাশাপাশি ছিল ব্যাপক কালোবাজারি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই অনলাইন টিকিট ব্যবস্থার সূচনা করেছে।

এ ছাড়া আমাদের রাজ্য আগে আন্তর্জাতিক স্তরে মুষ্টিমেয় পদকজয়ীদের অনেক সময় একটি সোনার হার বা একটি সরকারি চাকরি দিয়েই মন ভোলানোর চেষ্টা করা হতো। অন্য রাজ্য সেখানে কোটির অঙ্কে অর্থ এবং উচ্চ পদমর্যাদার চাকরি দিত। এখন বর্তমান

সরকারের আমলে ঘোষণা করা হয়েছে, অলিম্পিকে সোনা জিতলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৮ কোটি টাকা, রুপো জিতলে ৬ কোটি টাকা এবং ব্রোঞ্জ জিতলে ৪ কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ ছাড়া ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ক্রীড়া কর্মসূচি 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০০টি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের ঘোষণাও করা হয়েছে। লিয়েন্ডার পেজ ও বিজেন্দর সিংয়ের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদেরও রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নের কাজে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর নিয়মবহির্ভূতভাবে নিজের ছোট ভাই অজিত এবং বড় ভাই স্বপনের হাতে রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব তুলে দেন। তাঁদের সঙ্গে খেলাধুলার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলে বাম আমলে শুরু হওয়া ক্রীড়াক্ষেত্রের অবক্ষয় আরও গভীর হয় এবং প্রশাসনে এককেন্দ্রিকতার অভিযোগও ওঠে। এর ফলেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের উপস্থিতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের হারিয়ে যাওয়া ক্রীড়া সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ঘোষণা ও পরিকল্পনা অন্তত সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আবার জাতীয় ক্রীড়া মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ফিরে পেতে পারে। কারণ বাংলায় প্রতিভার কখনও অভাব ছিল না; অভাব ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধার।

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ তাই কেবল ৩৯টি পদকের গল্প নয়; এটি সীমিত সুযোগের মধ্যেও অসীম সম্ভাবনার গল্প। প্রতিটি স্বর্ণপদক জানিয়ে দিয়েছে যে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি রৌপ্যপদক আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। প্রতিটি ব্রোঞ্জপদক মনে করিয়ে দিয়েছে যে সংগ্রামই সাফল্যের প্রথম ধাপ।

গ্লাসগোর মাটিতে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ঘামে লেখা হয়েছে নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় রয়েছে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস এবং দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

যে জাতি তার খেলোয়াড়দের সম্মান করতে শেখে, সেই জাতিই বিশ্বমঞ্চে সম্মানের আসন লাভ করে। ভারতের সাম্প্রতিক ক্রীড়া সাফল্য প্রমাণ করে, সুপরিকল্পিত নীতি, আধুনিক প্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সামাজিক সমর্থন একসঙ্গে কাজ করলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব।

এবার সামনে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস। আয়োজক ভারত, শহর আহমেদাবাদ। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার ভারতের সামনে সুযোগ এসেছে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের, যা বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়া আসর হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিতে পারে। দেশের নিজস্ব দর্শক, পরিচিত পরিবেশ এবং উন্নত ক্রীড়া অবকাঠামো ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের আরও বড় সাফল্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে বলেই প্রত্যাশা।

একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কাছেও এটি একটি নতুন সুযোগ। আগামী চার বছরে যদি গ্রাসরুট স্তরে প্রশিক্ষণ, জেলা পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ, আধুনিক কোচিং ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো এবং স্বচ্ছ ক্রীড়া প্রশাসন নিশ্চিত করা যায়, তাহলে আহমেদাবাদের মঞ্চে বাংলার প্রতিনিধিত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে।

গ্লাসগো আমাদের গর্বের গল্প লিখেছে। আহমেদাবাদ সেই গল্পকে আরও মহিমান্বিত করার অপেক্ষায়। আশা করা যায়, আগামী চার বছরে ভারত যেমন আরও শক্তিশালী ক্রীড়াশক্তিতে পরিণত হবে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গও তার হারিয়ে যাওয়া ক্রীড়া ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে আবার জাতীয় পতাকাকে গর্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চে উড়িয়ে দেবে। তখন হয়তো বলা যাবে—জয়ী শুধু ভারত নয়; জয়ী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গও।

আজকের ভারত আত্মবিশ্বাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ভবিষ্যতমুখী। এই ভারত জানে, বিশ্বমঞ্চে সম্মান অর্জনের জন্য শুধু অর্থনৈতিক শক্তিই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং মানবসম্পদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ সেই আত্মবিশ্বাসেরই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

গ্লাসগো দেখিয়ে দিয়েছে, সঠিক পরিকল্পনা, দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আধুনিক অবকাঠামো এবং ক্রীড়াবিদদের প্রতি যথাযথ সম্মান থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এখন দৃষ্টি আহমেদাবাদের দিকে। ২০৩০ সালে নিজেদের মাটিতে ভারতের সামনে থাকবে ইতিহাস রচনার সুবর্ণ সুযোগ। সেই ইতিহাসে যদি পশ্চিমবঙ্গও আবার তার প্রাপ্য স্থান ফিরে পায়, তবে সেটিই হবে বাঙালির ক্রীড়া ঐতিহ্যের প্রকৃত পুনর্জাগরণ এবং নতুন ভারতের ক্রীড়া-উত্থানের এক পরিপূর্ণ অধ্যায়।

*কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পদক জয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতবিনিময়।*

*দিল্লি আইআইটি-র ৫৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের উদ্দেশ্যে বলেন, “এই ডিগ্রি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের প্রতীক নয়, বরং দেশের প্রতি অবদান রাখার এক গুরু দায়িত্বও বটে”।*

# প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নতুন রূপ পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ

- ডিবিটির মাধ্যমে **১০.২০ লক্ষ উপভোক্তার** ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো হলো **৬,১২২ কোটি টাকা**
- যাদের বাড়ির কাজ লিন্টেল পর্যন্ত শেষ হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে দ্বিতীয় কিস্তির **৬০,০০০ টাকা** করে দেওয়া হলো
- এই প্রকল্পের আওতায় এখন **১৮,৬৫,৫২৯টি পরিবার** নিজেদের পাকা বাড়ি তৈরি করছে
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের আওয়াস প্লাস সমীক্ষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই **১৯.৬৫ লক্ষ সম্ভাব্য উপভোক্তাকে** চিহ্নিত করা হয়েছে
- **২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত** বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার কাজ চলবে, যাতে কোনো যোগ্য পরিবার এই সুবিধা থেকে বাদ না পড়ে

## পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের মাথার ওপর একটি নিরাপদ ও পাকা ছাদ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।